সুরজ গাগরাই

মহাশ্বেতা দেবী

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী : ১৯৬৪
মাঘ : ১৩৭১

প্রচ্ছদ :
অলোক শংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :
শ্রী কালী চরণ দাস
মহাকালী প্রেস
১৯/ই, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

সমর সেন

সুলেখা সেন

॥ এক ॥

একদিকে বয়ে গেছে কুরুডা নদী অন্যদিকে কালী নদী। চেরো গ্রামের কাছে দুটি নদী মিলেছে ও খানিকদূর বহে মিশেছে চেরো নদীতে।

সবগুলিকেই নদী বলা হয় সম্মানার্থে। কুরুডা কালী ও চেরো একমাত্র বর্ষাকালে নদীর চেহারা নেয়। অন্য সময়ে শুকায়। আশ-পাশের অঞ্চল অসম্ভব শুকনো। এমন শুকনো মাটিতে গাছপালা হবার কথা নয়। কিন্তু তিনটে নদী আছে যখন, তখন ভূগর্ভে জল বোধহয় আছে। বন কিন্তু সবুজ।

চেরোর বুকে বাঁধ রচনা করে তিনটি নদীর জল ধরে রাখার প্রস্তাব অনেকদিন ধরে হচ্ছে। সুরজ গাগরাই যখন ছোট, তখন থেকেই ও শুনে আসছে যে, এই চেরোর বুকে বাঁধ হবে। তাতে জল এত হবে যে দরিয়ার মত পারাপারহীন। এপারে দাঁড়ালে ওপার দেখা যাবে না। এ সব কথা বুড়োরা বলত।

বলাই ভালো যে সুরজ কোনদিন এসব কথা বিশ্বাস করে নি। বিশ্বাস করবে কেন, তা তোমরাই বলো। সুরজ কোলহানের সন্তান। কোলহানে জঙ্গল আছে, খনি আছে, কত কি আছে। কি নেই?

কোলহান যাকে বলছি, তা হল সিংভূম। ওটা কোলদের দেশ। সায়েবরা সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, সকলকেই "কোল" বলে গেছে। তবে "হো"দের কোল বলাই ঠিক।

এই কোলহানের মাটির নিচে, পাহাড়ের বুকে কি নেই: ম্যাঙ্গা-নিজ, লোহা, তামা, অ্যাসবেসটাস, ক্রোমাইট, পারমানবিক খনিজ ইউরেনিয়াম, সিলিকা, সোনা কিরনাইট, অভ্র, লাইমস্টোন, বক্সাইট সবই আছে।

এগুলো কোলহানের নিজের জিনিস। তা যা কোলহানের নিজের জিনিস, তাতে তো টাটা, বিড়লা, ডালমিয়াদের পুরো দখল। কোলহানের সন্তানরা তো নিজের দেশে ভিখারি হয়েই আছে।

কোলহান আগে জঙ্গল দিয়ে ঢাকা থাকত! জঙ্গলটা ছিল সুন্দরী কোলহানের লজ্জাহরণ বস্ত্র।

সুরজ যখন দেখেছে তখন তার জননীর লজ্জা কেড়ে নিয়ে চলেছে তো চলেইছে ঠিকাদাররা। গাছের পর গাছ কাটা পড়ছে।

সুরজের পিতামহ মাটা গাগরাই বলত, এ এক জবর তামাশা। বুঝলি সুরজ ?

—কেমন তামাশা ?

—সরকার তো কাগজে আদিবাসীদের রাজা করে রেখেছে সিংভূমে। এ সব জঙ্গল বছর বছর ডাক হয়। সরকারের নিয়ম আদিবাসীর নামে ডাক হবে। তাই হয়। শুধু আদিবাসী তা জানতে পারে না।

—কে নেয় ডেকে ?

—কেন, দিকুরা ? যারাদের কাঠচেরাই কল, যারাদের কাঠ চালান্ কারবারী তারা।

—কেন নেয় ?

জঙ্গল আপিসে আর ঠিকাদারে যে খুব ভালবাসা। তাতেই নেয়।

—তোমার নামে কখনো ডাক উঠেছে ?

—নিশ্চয়। তিনবার।

—তুমি কেন চলে গেলে না জঙ্গল আপিসে ? তুমি কেন বললে না যে এ জঙ্গল আমার ?

—ও বাবা! তাই বলতে পারি ?

—কেন বলতে পার নি ?

—মেরে দেবে নিশ্চয়। জঙ্গল আপিসের গার্ডদের হাতে বন্দুক থাকে দেখিস নি ?

—তোমারও তো তীর-ধনুক আছে।

—না না, তাই হয় কখনো ? আমার নামে ডাক হল। তাতে বাবু বলল, দশটা টাকা নে। মদ, হাঁড়িয়া খাবি। ঠিকাদার বলল. আরো দশ টাকা দিতে পারি !

—তুমি সে টাকা নিলে ?

—না, আমি গ্রামের প্রধান। আমি তা নিতে পারি ? তা ছাড়া আমরা তো পাগুন জোংকোকে না বলে কোন কাজ করতাম না। পাগুন তখন খাদান থেকে হরতাল করে ফিরেছে। ও ছিল লড়াকু লোক।

—পাগুন কি বলল ?

—পাগুন আমাদের বলল, যা ! গিয়ে বল্‌গা যে পাগুন সব কথা বলবে।

—পাগুন কি করছিল ?

—পাগুন ওর বন্দুকে তেল দিচ্ছিল।

—বন্দুক ছিল ওর ?

—কেন থাকবে না ? ও তো পাগল ছিল। খাদানে কাজ করল, অনেক টাকা কামাল. আর বন্দুক কিনে নিয়ে চলে এল। বলল, বন্দুক হাতে থাকলে সাহস থাকে।

—তারপর কি হল ?

—পাগুন গেল। গিয়ে বলল, দেখ বাপু ঠিকাদার ! লাখ টাকা তুমি মুনাফা করবে, আর মাটা গাগরাইকে বিশ টাকা দেখাচ্ছ। মাটা তো সে কথা মানবে না। ফেল হাজার টাকা। নইলে জঙ্গল কাটাই কাজ হবে না।

—খুব সাহস ওর।

—খুব সাহস ছিল। এই ব্যাপার নিয়েই বহোত গোল বাধল আর ওই হাজার টাকা সে খিঁচেও নিল। আর তখনি ও জঙ্গল কুলি ইউনিয়নও বানিয়ে নিল আর সে বছর আমরা তিন টাকা করে মজুরিও পেলাম।

—পরের বছর ?

—আবার আট আনা। পাগুন তো মরে গেল অসুখ হয়ে।

আমাদের অসুখ বিসুখ ভাল করতে পারে দেওনারা। ডাইন বা ভূত ধরলে সোখা ছাড়াবে। অসুখ হলে দেওনা সারাবে। পাগুন সে কথা মানল না। ডোংগোলে গেল হাসপাতালে। তাতেই মরে গেল। আর ও যখন মরে গেল, কে আমাদের হয়ে লড়াই করবে?

—তাতা! আমরা কেন চাইবাসা বলি না? কেন বলি ডোংগোল?

—ডোংগোল আমাদের নাম। দিকুরা বলে চাইবাসা। আমরা চাকা বলি, ওরা বলে চক্রধরপুর।

—সে হাজার টাকায় কি করলে?

—পাগুনকে একশো টাকা দিলাম। গ্রামে সবাই খুব মাংস আর ভাত খেলাম। তারপব এই জমি কিনলাম। জমি যখন কিনি তখনি জানলাম না, তবে পরে জানলাম যে এসব জমি আমাদের এমনিতেই হত। কোন বা আইনে এ জমি আমাদের জন্যেই ছিল। লেখাপড়া জানি না, ঠকে তো যাবই। তাতেই তো তোকে লেখাপড়া শেখাতে ইচ্ছে করেছি।

সুরজ অনেকক্ষণ ধরে দাদুর কথাগুলো ভেবেছিল। তারপর বলেছিল, জঙ্গল কেটে সব কাঠ ওরা নিয়ে যায়?

—সব।

—আমাদের জঙ্গল তো আছে।

—এখানে তো ঢুকতে পারে না। এ যে কোলহান।

—কোলহানে ওরা ঢুকতে পারে না?

—ঢুকে তো গেছেই ওরা।

—আগে ঢুকতে পারে নি?

—না। আগে ঢুকতে পারে নি। কেন পারে নি, সব কথা তোকে বলে যাব। তোর বাবাকেও বলেছিলাম সব। সে তো থাকল না। কোলহান ক্রান্তিদলে চলে গেল। আর মরল সেই কতদূরে, টাটানগরের খাদান লড়াইয়ে।

এর পরেই সুরজ ইস্কুলে পড়তে গিয়েছিল। দেউরি তাকে আশীর্বাদ করেছিল। গ্রামের সবাই বলেছিল, সুরজ যাক পড়তে,

সঙ্গে যাক সমা। গ্রামের ভালো ছেলেগুলো পড়তে না গেলে আমাদের খুব কষ্ট। কিছুই বুঝি না আমরা হিসাবপত্তর। আর লড়াই করতে হলেও লেখাপড়া জানা মানুষ থাকা দরকার। এখন দিনকাল অন্যরকম। বনের চিরঞ্জি, মৌয়া বেচতে গেলেও ঠকে যাই।

সুরজ দাদুকে জিজ্ঞেস করেছিল, লড়াই করার কথা হচ্ছে কেন ? আমি তো পড়তে যাচ্ছি।

ওর মা বলেছিল, লড়কা-হো আমরা, দিকুরা বলে লাকরা-কোল। লড়াইয়ের কথা তো বলবেই ? আয় আমার সঙ্গে।

ছেলের হাত ধরে ও একটা বড় করম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থেকেছিল কিছুক্ষণ।

তারপর বলেছিল, ঘরে চল্।

ওই করম গাছটা এখন ওর বাবার চিহ্ন। টাটানগরে ওর বাবা মরে যায়। বাবাকে তো আনা যায় নি। সমাধি হয় নি, সমাধির ওপর পাথর, শ্মশান-ডিরি দেয়া যায় নি। তখন ঠাকুরদা এই গাছটা পুঁতে দেয়। বর্ষাকালে পুঁতেছিল। গাছটা লেগে যায়।

এখন গাছটা কত বড়, কেমন ঝাঁপালো। মায়ের কাছে একটি টিনের বাক্সে "কোলহান ক্রান্তিদল"-এর রসিদ বই আর একটা বিবর্ণ ঝাণ্ডা তোলা আছে।

সবুজ ঝাণ্ডা। সবুজের বুকে একটা তীর আঁকা আছে। কোলহান যখন স্বাধীন ছিল, তখন এমন ঝাণ্ডা নিয়েই সেদিনের লড়কা-হো জাতি সাহেবদের সঙ্গে লড়েছিল।

রামপুরের বোর্ডিং-এ যাবার সময়ে সুরজ আর সমা পথেই ঠিক করেছিল যে, ওরা খুব লেখাপড়া শিখবে।

অনেকটা পথ হেঁটেছিল ওরা। তারপর কালী নদী পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠেছিল। সেখানে কালীবাসা গঞ্জে মতি মুণ্ডার দোকানে গিয়েছিল। মতি মুণ্ডা ওদের তিনদিন আটকে রাখে। আরো চারটি ছেলে এসে জুটলে তবে ও সকলকে রামপুরে নিয়ে যায়। বলে, এখন তো মাস্টার খুব ফাঁপরে পড়েছে।

—কেন ?

—আদিবাসী ছেলে কোথায় ? সরকার ষাটটা ছেলের জন্যে টাকা দিচ্ছে। সব ছেলেই তো দিকুদের। আর ছেলে মোটে সতেরোটা। আমি ভাবলাম, এমন সুযোগ ছাড়তে আছে ? এখন যদি পারি তো ঢোকাই কতক আদিবাসী ছেলে। শুনতে পাচ্ছি মোহন তিরকে আসবে স্কুল দেখতে। সে এলে খুব ভাল হয়।

—মোহন তিরকে কে ?

—ওরাওঁ ছেলে। ইস্কুল-টিস্কুল দেখবার কাজে অফিসার। খুব সাচাই মানুষ। কোন দু-নম্বরী কারবারে থাকে না।

রামপুরে বোর্ডিং আর ইস্কুল দুটোই একটা ব্যারাক গোছের কাঁচা বাড়িতে। সুরজদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল খুব ছোট একটা ঘরে। খুব বড় বড় দুটো ঘরে ছিল বর্ণহিন্দু ছেলেরা। আরেকটি বড় ঘরে বাসনপত্র ও আসবাব রেখে বন্ধ করা থাকত।

বিকেল সেদিন বোর্ডিং-এ শুধুই আছে। সাইকেল চেপে হঠাৎ একটি আদিবাসী যুবক হাজির। সঙ্গে একটা চামড়ার ব্রিফকেস।

—এটাই তো স্কুল ?

—হ্যাঁ।

—তোমরা ছাত্র ?

—হ্যাঁ।

—অন্যরা কোথায় ?

—রাওল সাহেবের বাড়ি।

—সেখানে কি হচ্ছে ?

—রাওল সাহেবের ছেলের সালগিরাতে খাওয়া-দাওয়া হবে। অনেক লোক খাবে।

—মাস্টারজী একা গেছেন ?

—না, বোর্ডিং-এর দিকু ছেলেরা গেছে।

—তোমরা পাঁচজন বাদ পড়েছ ?

—আমাদের নিয়ে গেল না।

—তোমরা কি খাবে ?

—জানি না।

যুবকটি কি ভাবল। তারপর বলল, চল আমার সঙ্গে। আজ তোমরাও ভোজ খাবে। আমারও খিদে পেয়েছে খুব।

দোকানে ওদের নিয়ে যায় যুবকটি। সে কি ভোজ! পুরি, কচৌরি, জিলিপি! যত ইচ্ছে খাও। পয়সার কথা ভেব না। দোকানীটি যুবকটিকে খুব সমীহ করছিল। যুবকটি সুরজদের জিজ্ঞেস করতে থাকল।

—সকালে কি খাও?

—কিচ্ছু না।

—সকালে পড়?

—না। জল তুলি কুয়া থেকে। সবজি বাগানে জল দিই। তারপর মাস্টারজীকে স্নানের জল দিতে হয়। রান্নার জন্যেও জল তুলি। তারপর স্নান করি।

—তখন খাও?

—হ্যাঁ।

—কি খাও?

—ভাত আর ডাল।

—পেট ভরে?

—না।

—ভাত চাও আরো?

—না। মিশিরজী বলে, সরকার অত ভাত দেবার পয়সা দেয় না। যে ঘর থেকে চাল আনবে সে ভরপেট খাবে।

—বিকেলে কি খাও?

—কিছু না।

—তারপরে?

—রাতে রুটি আর ডাল।

—তোমরা যা খাও, অন্য ছেলেরা তাই খায়?

—ওরা সবজি খায়,-দই খায়।

—তোমরা একসঙ্গে খাও?

—না, ওরা আলাদা বসে।

—বাসন-বর্তন কে মাজে ?

—আমাদেরটা আমরা মাজি।

—ওদেরটা ?

—ওদের দু'জন চাকর আছে।

—খুব ভাল, খুব ভাল।

দোকানদারটির সম্ভবত মাস্টারজীর ওপর পুরনো রাগ ছিল। সে বলল, তিরকেজী! আপনি কি ভাবছেন? এতদিন তো কোন আদিবাসী ছেলেই ছিল না। আপনি আসবেন জেনে মাস্টারজী মতি মুণ্ডাকে ডাকল। মতি খবর করিয়ে এদের জোগাড় করে এনেছে। এতদিন হয়ে গেল, তা চার বছর তো হবেই। আমি কখনো কোন আদিবাসী ছেলেই দেখলাম না।

—এবার দেখবে।

সুরজরা তখন বুঝল, এই যুবকটিই মোহন তিরকে। ওরা খুব ঘাবড়ে গেল। মোহন তিরকে খাবারের দাম চুকিয়ে দিল। তারপর সুরজকে বলল, আরো আদিবাসী ছেলে আসবে না খবর করলে পরে ?

—নিশ্চয় আসবে।

দোকানীটি বলল, আদিবাসী ছেলেদের তো ও রাখতেই চায় না। রাওল সাহাবের হাতের লোক ওই মাস্টারজী। ওই ছেলেরা রাওল সাহেবের কাছারির নায়েব-গোমস্তাদের ছেলেপিলে। ওদেরই রাখে।

—ওরা তো আদিবাসী নয়।

—আপনারাই তো এ সব বাধান তিরকেজী। কখনো আসেন না, দেখেন না। দেখলে পরে সব ঠিক থাকে। আপনি তো এমন হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়েছিলেন বলে আমাদের সাজহাতু আর উলিকাড়ের ইস্কুলগুলো ঠিকমতো চলছে। আমি তো সব দেখতাম আর বলতাম, মহাবীরজী যদি সত্যি হয়, দেব-দেবতার মাহাত্ম্য যদি থাকে, তবে মোহন তিরকেও আসবে আর মাস্টারজীর কাজের যোগ্য সাজাও মিলবে।

—তোমার রাগ কেন ভাই ?

—উনি কায়স্থ, আমি যাদব, আমাদের উনি ছোট জাত বলেন আর খুব ঘেন্না করেন। একটা চিঠি কখনো লিখে দেন না। আর পড়ান নাকি উনি ? রামপুরে তিনটে দোকান দিয়েছেন।

মোহন তিরকে সে রাতে সুরজদের পৌঁছে দিয়ে যায় আর ওই দোকানে ঘুমোয়! সকালে সে বোর্ডিং-এ এসেছিল। সুরজরা কি যে বলেছিল মাস্টারকে তা কেউ জানে না। কিন্তু সেদিনই সুরজরা চালান হল একটি বড় ঘরে। আর মাস্টারের নামে সাতকাহন কি সব লিখে অনেক টাকা তছরুপের দায়ে ফেলে তাকে সাসপেণ্ডও করেছিল। তখন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এক মুণ্ডা আই এ এস। ফলে রাওল সাহেব তেমন সুবিধে করতে পারে নি।

এর পরেই আদিবাসী ছেলে আরো আসে। মাস্টারও হয় আদিবাসী। রাওল কাছারির ছেলেরা এ স্কুল ছেড়ে চলে যায়। নতুন মাস্টার—বোর্ডিং সুপার কালু সুমরাই খুব এলেমদার মানুষ। তার চেষ্টাতে ইস্কুলবাড়ি তৈরী হয় একটা। বোর্ডিংটা বড় হয়।

রাওল সাহেব এখন রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে। সে বোঝে যে রামপুরে পড়ে থাকলে আর পুরনো চালে চললে "মায়লে বাবু" হওয়া যাবে না। আর দিনকাল খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখন আর রাওলজী বলে কেউ মানতে চায় না। মন্ত্রী না হোক, মায়লে বাবু হলেও অনেক ক্ষমতা থাকে হাতে।

মুশকিল হল, আদিবাসীদের মন জয় করতে হবে। এই অঞ্চলটিতে লরকা-কোল বা হো অদিবাসীদের বাস। হো দেশে রাওলরা "কোচে দিকু" বা প্যাঁচালো ও ধূর্ত দিকু বলে পরিচিত। রাওলরা অনেক ঘোরপ্যাঁচ করে উইলকিনসনের মানকি ব্যবস্থা চালু হবার আগেই এ সব অঞ্চলে ঢুকেছিল হো-দের বন্ধু সেজে। হো-রা সে কথা ভোলে নি। এখন ওদের মন জয় করা খুবই কঠিন।

রাওলের শ্বশুর সমস্যাটির কথা শুনে খুব হাসে। বলে, গ্রাম দেশে বাস, তাতেই বুদ্ধিনাশ। কেন, স্কুলটা আছে না ?

—আছে তো।

—খেলাধুলোতে উৎসাহ দাও। তাতে পুরস্কার দাও। ওরা খেলাধুলো ভালবাসে।

এমনি করেই জন্ম নেয় রামপুর ক্রীড়াকেন্দ্র, যার স্থায়ী সভাপতি হয় রাওল সাহেব অফ রামপুর। যার বার্ষিক প্রতিযোগিতায় দৌড়, লাফ-ঝাঁপ, নানা বিষয়ে আদিবাসী ছেলেরাই পুরস্কার আনে অনেক-গুলো।

কালু সুমরাইয়ের বুক গর্বে ভরে যায়। সে বলে, রাওল সাহেব! আমার ছেলেরা তালিম পেলে জিলা স্পোর্টে জিতে আপনাকে শীল্ড এনে দেবে। অনেকদিন হল শীল্ড রামপুরে আসে না।

রাওল সাহেব বলে, এ তো খুব ভাল কথা।

—একটা ব্যাণ্ড পার্টিও হতে পারে। ভাল ব্যাণ্ড পার্টি থাকলে বাইরে থেকে ভাড়া করতে হয় না।

—এ আরো ভালো কথা।

সবই করে দেয় রাওল সাহেব এবং এভাবে তার সপক্ষে জনমত খানিক ঘোরে। বহুকাল আগের মত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রণ যায় হাতু থেকে হাতু, বা গ্রাম থেকে গ্রামে গ্রামপ্রধান মুণ্ডাদের কাছে।

এই মুণ্ডারা সব সময়ে মুণ্ডা জাতির নয়। গ্রামসমাজ যখন ছিল সূর্যসমান ক্ষমতাশালী, তখন সমাজের মাথা যে, সেই ছিল মুণ্ডা। এ অঞ্চলে অনেক জায়গায় এখনো গ্রামপ্রধান হো-মুণ্ডা বা শুধুই মুণ্ডা।

তেমন দিনকাল নেই, তেমন সমাজ নেই, তেমন সময় নেই। গ্রামও তেমন নেই। সাহকার, মহাজন, ফড়িয়া, বেনিয়া, উত্তর বিহার ও রাজস্থানের দিকু সব কোলহানের গ্রামে গ্রামে।

তবু সসম্মানে আমন্ত্রণ পেয়ে গ্রামবৃদ্ধরা আসে রামপুরে। আদি-বাসী ছেলেদের আশীর্বাদ করে। বিমুগ্ধবিস্ময়ে দেখে খেলাধুলো। রাওল সাহেব অসম্ভব রাজনীতি জ্ঞান ও কৌশলে মাটা গাগরাইয়ের হাত দিয়ে পুরস্কার বিতরণ করায়।

- তুমিই তো বয়সে প্রবীণ, আর সম্মানিত লোক। তোমার অল্পবয়সে কি শক্তি আর ক্ষমতা ছিল সে তো আমরা জানি।

অন্য আদিবাসী গ্রামপ্রধানরা চুপ করে থাকে। এসব শহুরে মাথাদের কাছে ওর কথায় পারবে কেন? খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে থেকে মাটা গাগরাই পুরস্কারগুলি দেয়। খুব হাততালি পড়তে থাকে। পুরস্কার দেয়া শেষ হলে মাটা বসে পড়ে। সবচেয়ে বেশী হাততালি দেয় রাওলের শালা নবল সিং।

বসে পড়ার পর মাটার মাথা থেকে বিহ্বল ভাব কাটে। এখন তার মনে হয়, ওই নবল সিংয়ের বাবা আর নবল সিং চিরকাল চেরো জঙ্গল ব্লক আদিবাসীর নামে ডেকে নিচ্ছে। লাখ লাখ টাকা করেছে জঙ্গল থেকে। রাঁচি, টাটানগর আর পাটনাতেও বাড়ি করেছে, সারন জেলায় ক্ষেতীজমি করেছে। আদিবাসীরা শুকনো মুখে জোগাড় করে চলেছে আর জঙ্গল শাস্ত্রীদের জোগাড় করে চলেছে আর জঙ্গল সান্ত্রীদের মার খাচ্ছে।

এখন তার মনে হয় এভাবে ওদের কথায় পুরস্কার দিয়ে ও তার জাতের অসম্মান করেছে আজ। দুঃখে ও ব্যর্থ ক্ষোভে ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। সবাই ধরে নেয় ওটি আনন্দাশ্রু। নাতি "বেস্ট অ্যাথলেট" হয়েছে, বুড়োর মনে আজ আনন্দ ধরছে না।

এই ক্রীড়া উৎসবের কারণে ইস্কুল তিনদিন ছুটি হয়ে যায়। সুরজ আজ মাটার সঙ্গে গ্রামে যাবে। মাটাকে কালু সুমরাই বলে, কিছু কি ভাবলে?

—কি ভাবব?

—সুরজ কি করবে?

—কেন? পড়বে না?

—সুরজের তো আট ক্লাস পড়া হল, আর ওর বয়সও হল উনিশ।

—হ্যাঁ, তাই তো হল।

—আমাদের ছেলেরা তো পড়তে আসে বেশি বয়সে। বয়স অনেক হয়ে যায়।

—সেই তো কথা।

—কি করবে ওকে নিয়ে?

—আরো পড়লে তোমার মতো মাস্টার হতে পারে। তাই না? তখন মাস্টারি করতে পারে।

—তা তো পারে। তবে আমার একটা কথা ছিল। যাব তোমার গ্রামে। আমার ভাই আসছে, তাকে নিয়ে যাব। তখন কথা বলব।

—এস। তুমি মাস্টার, আমার গ্রামে আসবে এ খুব ভাল কথা।

সুরজ আর মাটা গ্রামে ফিরেছিল। ফিরেই মাটা বসেছিল নতুন খাটিয়া বাঁধতে অতিথিরা আসবে, তাদের শুতেবসতে চারপাই চাই। সুরজ বলেছিল, বন থেকে বরা কি একটা পাব না?

ওর মা বলেছিল, না পেলে মুরগি কাটব।

তারপর সুরজের মা শ্বশুরকে বলেছিল, পারশ জোংকোর মেয়েটা বড় হয়েছে।

—সুরজের বউ করবি?

—আমি কি বলব?

—কত বড় হল?

—ষোল বছর তো হবে।

—ওই বয়সেই তুইও এসেছিলি।

—বাড়িতে আনন্দ নাই অনেকদিন।

—মেয়ের বাপ কি চায় আবার।

—তেমন চাইবে না।

—তোকে বলেছে?

সুরজের মা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, নান্দি ওর মাকে বলেছে যে, সুরজকে ওর মনে ধরেছে। আর অনেক অনেক পণ চাইলে চলবে না।

মাটা হেসে বাঁচে না। দেখ দেখ, আজকালকার মেয়েদেব বুদ্ধি কত অন্যরকম। তোর শাশুড়ি তো তিনটে গরু বাপকে না দেয়া অবধি রাজি হয় নি। আর তুই বেঁকে বসেছিলি পাঁচটা গরু দিতে হবে তোর বাপকে। এ কেমন মেয়ে দেখ।

সুরজের মা বলল, দেশে তো এই নিয়ম।

—নিয়মটা ভাল নয় রে। তাতেই হো জাতে অনেক মেয়ে, অনেক ছেলে আইবুড়ো থেকে যায়।

কথাটি খুব সত্যি। সুরজের মা ভেবে পায় না যে নান্দি এমন কথা কোন্ সাহসে বলল ? হো মেয়েরা বিয়ের সময়ে কন্যা পণের ওপর খুব জোর দেয়। মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ের বাপ পায় গরু-ছাগল। পণ জোগাড় করতে ভাবী স্বামী ফতুর হয় তো হোক। হো মেয়েব মনে সান্ত্বনা থাকে যে তার পরিশ্রম, তার কামাই বাবা আর পাবে না। তবু ওই গরু-মোষ পেলে বাপের অভাব ঘুচবে।

তবু তো নান্দি এমন কথা বলেছে তার মাকে। সাহসী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে। তবে তার ছেলে যে রকম হট্টা-কট্টা জোয়ান, মেয়েও তেমন হলে ভাল হত।

নান্দি তাকে বিয়ে করতে চায় শুনে সুরজ বলল, ও তো পাখির মতো পাতলা মেয়ে। এক চড় মারলে উড়ে যাবে।

নান্দি একথা শুনে বলল, ওঃ! চড় মারলে উড়ে যাবে। এত সোজা নয়।

এর মধ্যেই এসে পড়ল কালু সুমরাই আর তার ভাই গণেশ। কালু সুমরাই লতায়-পাতায় সুরজের মায়ের ভাই হয় কি রকম। কালু ও গণেশ সুরজের মাকে "আজি" বা "দিদি" বলে ডেকেই বাড়ি ঢুকল। সুরজের মা ওদের "উন্দি" বা ছোট ভাই না বলে করে কি ? তখন সুরজের তো বোন নেই, পাড়ার আইবুড়ো মেয়েদের ডাকতে হয়। অতিথিদের পা ধোয়াবে, কে দেবে জল ?

নান্দি এল, নান্দি! ও ছাগল চরাচ্ছিল। ছাগলটা সুরজদের বাড়িতে কুল গাছে বাঁধল। তারপর অতিথিদের পা ধোয়াল, জল দিল। চাল কুটে দিল উদুখলে। জল তুলে দিল কুয়ো থেকে। তারপর বলল, মাকে পাঠিয়ে দেব ?

—পাঠিয়ে দে। আমি ওদের দিদি, ওরা আমার ভাই, সব তো ভাল কথা। কিন্তু অতিথিও তো। তার ওপর মাস্টারি করে। কি জানি, আমাদের জাতে মাস্টার হবে, পায়ে জুতো পরবে, চোখে চশমা পরবে, কে জানত।

—কি রাঁধবে ?

—শাক রাঁধব। আর ডাল।

এই অনেক খাওয়া। সুরজের মা, মাটা, এ গ্রামে সকলেই ভাত রাঁধলে ভাতের ফেনে নুন আর মরিচ গুঁড়ো মেশায়। তার টাকনা দিয়েই ভাত খায়। ভাতই তো একটা জীবনদায়ী ব্যাপার। ভাত থাকলে কি ব্যঞ্জন লাগে না কি ? তবে অতিথি বলে কথা। এমন সম্মানিত অতিথি !

খাওয়াদাওয়া হলে কালু বলে, আমার ভাই কি বলতে এসেছে তা মন দিয়ে শোন। আমার ভাই থাকে টাটানগর। রেলের আপিসে ও কেরানী।

গণেশ বলে, আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি, তুমি গ্রামের পাঁচজনকে বলে দেবে।

মাটা জোরে জোরে মাথা নাড়ে।

—মন দিয়ে শুনবে আর বুঝে দেখবে।

—বল না বাপু।

—আমি শহরে থাকছি আর অনেক খোঁজখবর নিয়ে দেখছি যে আমার জাতির ছেলেরা, শুধু তারাই বা কেন; আদিবাসী জাতির ছেলেরা আদিবাসীদের জন্যে যে সব চাকরিবাকরি থাকে তার খবরও রাখে না, নামও লেখায় না এক্সচেঞ্জে, আর শেষ অবধি সে সব কাজ অন্য জাতের ছেলেরা পেয়ে যায়।

মাটা বলল, তা তো হবেই। এ কথা আমার ছেলেও বলত। তা গ্রামগুলো কত দূরে দূরে, কে বা খোঁজ রাখছে বল ? লেখাপড়া বা কতজন শিখছে ?

—খুব ঠিক কথা। তা আমি এখন ঠিক করেছি যে খোঁজ রাখব আর আদিবাসী ঢুকাতে চেষ্টা করব। যেমন কাজ হোক না কেন। মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, ওরাওঁ সব ঢুকাব।

—সবাই কি চাকরি করবে ?

—যার যেমন বিদ্যে। তা সুরজ, সমা, আর মোকাম,—এ গ্রামের তিনটে ছেলেকে দেখলাম বয়স হয়েছে, খেলাধুলো ভাল

করে, বলোয়ানও আছে। ওদের আর পড়াবে কেন? রামপুরের পড়া তো খতম। এখন যেতে হবে সাজুহাতুর ইস্কুলে। সে অনেক দূর আর পড়া কিছু হয় না। সাত বছর হয়ে গেল, তা একটা আদিবাসী ছেলে এতদিনে ম্যাট্রিক পাশ করল।

—ওরা কি করবে?

—বলোয়ান ছেলে। বিহার সরকারের ফৌজে দিয়ে দাও। যদি "হ্যাঁ" বল, তাহলে নিয়ে যাব।

—ফৌজে যাবে? সিপাহী হবে?

—কেন হবে না? আদিবাসী ছেলে যে কাজ ধরবে তাই করতে পারবে। এমন নজির তৈরী করতে হবে। এ তো বীরের কাজ।

সুরজের মা বলল, ওর যে বিয়ে দেব।

—দু'বছর বাদে দিও।

—লড়াই করতে যাবে?

—নিশ্চয়।

—যদি মরে যায়?

—সব ফৌজী সিপাহী কি মরে যায়? তা ছাড়া, জন্মেছে যখন, মরবে তো সকলেই।

কালু সুমরাই বলল, ছেলেরা ফৌজী সিপাহী হলে গ্রামে-গঞ্জে সম্মান খাতির হবে। তখন কোন না কোন দরকার হলে ওদের কথার দাম থাকবে সরকারের কাছে।

এ কথাটি মাটার মনে খুব ধরে। তারপর যখন জানা যায় ফৌজে মাইনে আছে, আরো নানারকম সুযোগ-সুবিধা আছে,—ফৌজী সিপাহীর গ্রামে হামলা হয় না চট করে,—সুরজের মাও রাজী হয়।

সুরজ নেচে ওঠে আনন্দে। এই তো জীবন। ফৌজে যাবে, সিপাহী হবে, কি উত্তেজনাময় হবে জীবন।

পরদিন ও হাটে গিয়ে নান্দিকে খুঁজে বের করে। নান্দি বলে, এই যে। আমিও তোকেই খুঁজছিলাম।

—আমিও তোকে খুঁজছি

—পেয়েছিস খুঁজে ?

—পেয়েছি।

—বল কি বলবি। তুই তো ফৌজে যাচ্ছিস।

—ফৌজে গেলেও ফিরে আসছি আর তোদের বাড়িতে আমার তাতাও যাচ্ছে কথা বলতে।

—কি দিবি তোরা ?

—কি দেব ? তুই নাকি কিছুই নিবি না, শুধু আমাকেই নিবি। তাই তো শুনলাম।

—একটা মোষ দিলেই হবে।

—তখন তো আমি কিনেই দিতে পারব।

নান্দি বলে, না না। টাকা জমাতে হবে।

—তোর আমাকেই পছন্দ হল ?

নান্দি খুব সরল বিশ্বাসে বলে, শুধু শুধু তো পছন্দ হয়নি রে। আমার দিদিটার বিয়ে হল রাজাখরসোয়াঁ, আর দেখাই হয় না আমাদের সঙ্গে। পিসির বিয়ে হল, তারা চলে গেল ধানবাদে কয়লা কাটতে। আর এল না। আমি ওরকম দূরে চলে যেতে চাই না।

—গ্রামে আরো ছেলে আছে।

—তোদের তবু পাঁচ বিঘা জমি আছে। দিদির বর, পিসির বর মেয়ে পণ দিয়ে ফতুর হয়ে গেল বলেই তো ওরা দু-জনেই স্বামীদের সঙ্গে চলে গেল খাটতে আর খেতে।

নান্দি কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। তারপর একটা গাছে ও হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সুরজ খুব অবাক হচ্ছিল। ওর সমীহও হচ্ছিল নান্দিকে। নান্দি তো খুব ভেবেছে এ সব কথা নিয়ে।

—আমার বাবা যদি দুটো-তিনটে গরু-মোষ চেয়ে বসে, তা তো গ্রামে দিতেই পারবে না কেউ। করজ নিতে যাবে রামপুরে সাউদের কাছে। তারপর ফতুর হয়ে যাবে আর সাউরা ওদেরকে ঠিকাদারের কাছে বেচে দেবে।

—বেচে দেবে ?

গ্রা

—বেচেই তো দেয় রে। করজের টাকাটা ঠিকাদার দিয়ে দেয়। তারপর যেখানে কাজে দেবে সেখানে কাজ করো, টাকা নেবে ঠিকাদার। কত খারাপ জায়গায় পাঠায় ঠিকাদার। খাদানে গেলে মেয়েদের ইজ্জত থাকে না।

—স্বামী সঙ্গে থাকে তো।

—তবু ইজ্জত থাকে না।

—আমাদের মেয়েদের!

—হ্যাঁ রে। তোর সঙ্গে বিয়েটা হলে গ্রামেই থাকলাম। তোরা একটা মোষ দিতে পারবি। দিদির বিয়েতে, পিসির বিয়েতে, বাবা তো অতগুলো গরু-মোষ পেল। রাখতে পারল কি? আকালের কালে বেচে দিতে হল তো। তাই অনেক ভেবে বলেছি যে গ্রামের মধ্যে বিয়ে করব।

—ভালো। তাহলে "মাঘে" পরবে, "বাহা" পরবে আর কারো সঙ্গে নাচিস না।

—তোর সঙ্গে নাচব।

—আমি তো চলে যাব।

—তুই ফিরে এলে নাচব।

সুরজের কাছে খেলাধুলো করে নগদ পুরস্কার দশটি টাকা ছিল। ও আবার নান্দিকে নিয়ে হাটে যায়। গলার চুড়ি কিনে দেয় নান্দিকে। এটা ওর নিজের টাকা। আর যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার সঙ্গে এটুকু মেলামেশা ওদের সমাজে খুবই স্বীকৃত। হো মেয়েরা খুবই স্বাধীন।

পরদিন নান্দির মা সুরজকে মৌয়ার পিঠে খাইয়ে যায় আর তার পরদিন সুরজ সমা ও মোকাম গ্রাম ছেড়ে ফৌজী সিপাহী হতে চলে যায়। গণেশ বলেছে, আদিবাসীরা তীরের নিশানা ভাল বেঁধে, বন্দুকের নিশানাও।

চেরো নদী পেরোবার সময়ে সুরজ বলে, চেরোতে বাঁধ হবে আর অনেক জল থাকবে আর সব বানঝারা জমি সবুজ হয়ে যাবে এ কথা আমি কবে থেকে শুনছি।

সমা বলে, ওসব মিছে কথা।

মোকাম বলে, বাঁধ দেবে কোথায়? কেমন করেই বা দেবে? আর কেনই বা দেবে?

সুরজ বলে, বাঁধ দিলে নদী ক্ষেপে যাবে।

রামপুরে পৌঁছে ওরা গণেশকে পায়। তারপর বাস বদল করে করে রামগড় পৌঁছে যায়।

॥ দুই ॥

সুরজ গাগরাই, সমা আর মোকাম ফৌজী সিপাহী হয়ে যায় খুব সহজে। দু-বছর বাদে সুরজ যখন গ্রামে ফেরে, সে আসে কালু সুমরাইয়ের একটা চিঠি পেয়ে। মাটা খুব অসুস্থ, সে নাতিকে দেখতে চায়।

ছুটি নিয়ে নেয় সুরজ। কি অসুখ তার তাতার, কেমন অসুখ তা তো জানে না। অন্য সিপাহীরা বলে, মিছরি আর সাবু কিনে নিয়ে যাও ভাই। যেমন অসুখই হোক, সাবু-মিছরি ঠিক কাজে লাগবে।

মাটাকে দেখেই ও বোঝে, তাতা আর ভাল হবে না। খুব পেটরোগা, খুব দুর্বল, আর নিশ্বাসে কেমন একটা দুর্গন্ধ এসে গেছে। গ্রামের সবাই ভীড় করে আছে ওদের বাড়িতে আর সুরজকে দেখে সবাই হালে পানি পেল।

. হাঁা হাঁা, সুরজ ছিল না ঘরে, তবু ওরা যথাসাধ্য সব চেষ্টা করেছে। মাটার নিষেধ শোনে নি, রামপুরে হাসপাতালেও নিয়েছে বয়ে। ডাক্তারবা সবাই যত্ন করে দেখেছে। কালু সুমরাই ছিল। কোন কষ্ট হয় নি।

কিন্তু মাটাকে ডাক্তাররা ভাল করতে পারবে না। পেটের মধ্যে যে নাড়ী থাকে, তাতেই ঘা হয়ে গেছে অনেক। এ এক খুব খারাপ ধরনের ঘা। এখন মাটা গাগরাই তার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, তার সময় হয়েছে। এগুলো জীবনের নিয়ম। জন্মালে মরতেও হবে।

তবু ও যেতে পারছে না দেহের বন্ধন ছেড়ে। তোর বিয়েটা দেখে যেতে চায়। জেনে যেতে চায় যে তোর বিয়ে হল, বংশটা ওর থাকবে।

সুরজ তার তাতার কাছে বসে।

এখন গ্রামবাসীরা যে-যার ঘরে যায়। নাতি কাছে বসুক, জুটে। কথা বলুক।

সুরজের মা বলে, কত কি বলছে তোর তাতা। কোনদিন আমি তাকে একসঙ্গে এত কথা বলতে শুনি নি। এত কথা তো আমি কখনো জানি নি।

—কি কথা?

—তোকে বলবে।

—থাক, এখন ঘুমাচ্ছে।

—তোর খুব কষ্ট গিয়েছে মা!

—অনেক ভাগ্য তোর যে, নান্দি তোর বউ হচ্ছে। ও না থাকলে তো আমি মরেই যেতাম। খবর পেয়ে সেই কোথায় রাজাবাসা, কোথায় উলিহাতু কত দূর থেকে সব লোক আসছে তো আসছেই।

—তাতাকে দেখতে?

—নয় তো কি?

—কি বলছে তাতা?

সবই তো তোকে বলছে। আমরা যে ঘরে আছি, সে জ্ঞানই তো নেই।

—কি বলছে?

—নিজে শুনিস।

সুরজ তাতার কাছে মাটিতে শুয়ে থাকে। ও ঘরে আছে, তাই মা ঘুমিয়ে পড়ে পরম নিশ্চিন্তে। ঘুমোবার আগে বলে, কালু মুমরাই আমাকে এমন "আজি" বলল, এমন ঘরের ছেলের মত এল গেল, সেই তোর তাতার মাথায় এ সব কথা ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

—কি কথা?

—সে কত কথা। তার তো মাথাটা গেছে একেবারে। কতদিন চাকরি করে তাই দেখ্ এখন।

কিছুই বোঝে না সুরজ। মা ঘুমিয়ে পড়ে। সুরজের চোখেও

ঘুম নামে। আর ঘুম ভাঙে তার কোন এক অস্বস্তিতে। মাথা থেকে ঘুমের ঘোর কাটলে তবে সে বোঝে যে তাতা কি যেন বলছে।

সুরজ উঠে বসে। লণ্ঠনটা উসকে দেয় ও।

তাতার চোখ দুটি বন্ধ। ঠোঁট নড়ছে। কথা বলছে তাতা কি বলছে? উদগ্র কৌতূহলে সুরজ ঝুঁকে পড়ে। এখন কথাগুলি দমকে দমকে বেরোতে থাকে। ···না না, এ তুই খুব ভাল কাজ করছিস কালু··· সিংভূমকে কেউ বশ করতে পারে নি ······ বশ মানাতে পারে নি ······ লড়কা কোলদের ······ সিংরাই আর সুরজা ······ সুরজা আর সিংরাই ······ কেউ লেখেনি তাদের কথা ······ লিখবে কেন?

সিংরাই! সুরজা! এ সব নাম সুরজ কখনো শোনে নি। ও বোঝে যে ওর ঠাকুর্দা, ওর তাতা বলেছে "সুরজা" তাতে মা ভেবেছে "সুরজ" বলছে।

সুরজ মাটার মুখ ও কপাল মুছে দেয়। সম্ভবত খানিক আরাম পায় তাতা। ঘুমিয়ে পড়ে। সুরজ তাতার একটি হাত তুলে দেখে। খুব দুর্বল হয়ে গেছে। মনের অতলে কি যেন হারিয়ে যাবার অনুভূতি। তাতা কি মরে যাবে?

সকালে সুরজ ওদের ছাগলটা দোয়। গরম দুধ খাওয়ায় তাতাকে। মাকে বলে, সাবু আর মিছরি জ্বাল দিতে পারবে? তাতাকে খেতে দেব।

—দেখি পারে কি না।

সবাইকে অবাক করে মাটা গাগরাই খানিক সুস্থ হয়ে ওঠে। আর একটু সুস্থ হতেই সে বলে, সুরজের বিয়ে দে। আমি দেখে যাই।

—আমার তো ছুটি নেই।

বিয়েটা করে যা। আমার দেখা হবে না তোর বিয়ে। আর কালু সুমরাইকে আসতে বলবি।

এমনি করেই সুরজের ঘরে নান্দি এল বউ হয়ে। একটি মোষ

কন্যাপণ, অন্য মোষটি বেচে বিয়ের ভোজ। সুরজ চোখে অন্ধকার দেখল। এই এক জোড়া মোষ সে কতদিনে কিনতে পারবে?

নান্দি বলল, যত দেরি হবে ভাবছ, অত দেরি হবে না। ছাগল পালব. চরাব, বেচব।

—যা পারিস্ কর।

খুব মন দিয়ে মাটা গাগরাই নাতির বিয়ের সব আচার-নিয়ম ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না তা দেখল। বিয়ের ভোজ সে মুখে ঠেকাল মাত্র। কালু সুমরাই এ বিয়েতে একশো টাকা দিল। সে টাকা থেকে নান্দির কাপড়, দস্তার গহনা সব কেনা হল।

কালু সুমরাইকে সুরজ জিজ্ঞেস করল, তাতাকে আপনি কি বলেছিলেন? তাতা বলছিল সিংরাই আর সুরজা?

—হো জাতির ইতিহাস লিখছি।

—আমাদের ইতিহাস?

—হ্যাঁ সুরজ। বহোত গৌরবময় ইতিহাস? সিংরাই আর সুরগা আমাদের দুই নেতা ছিল।

—তাতা বলছিল সুরজা।

শুনতে ভুল করেছে।

—তাতাকে বলেছেন?

—হ্যাঁ। প্রাচীন লোকেরাই তো জানবে। আমাদের তো লিখিত লিপি নেই।

—আমাদের ইতিহাস?

—নিশ্চয়। আমরা লড়কা হো। মোগল, মারাঠা, ইংরেজ, রাজাবাদশা সবাই আমাদের ভয় পেতে। আমরা বলতে গেলে এক ভাগ লোকও হিন্দু হইনি, ক্রিশ্চানও হইনি। তা সে ইতিহাসটা জানতে হবে না?

—এখন তো হো জাতি খুব মার খাচ্ছে।

—ইতিহাসটা জেনে গেলে হো জাতি আবার মাথা তুলতে পারবে। মাটা গাগরাই অনেক জানত।

—আপনি এই সব করছেন?

—নিশ্চয়। সবাই বলছে আমি পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু পাগল আমি হই নি। দেখ! বিয়ে করেছিলাম, বউ মরে গেছে। ছেলেটা মামার বাড়িতে থাকে। আমার কিসের ভাবনা? যা কামাই করেছি সব দিয়ে এই ইতিহাস ছাপাব, আর হো লোকদের জানাব।

—মাস্টারজী! লেখাপড়া তো খুব কম হো শিখতে যায়। সেটা আগে দেখুন।

—সব দেখব।

সুরজ আর কিছু বলে না। তারপর বলে চেরোতে বাঁধ দেবার কোন নতুন কথা হল?

—সে তো মাঝে মাঝেই শুনছি।

—শুনেছি বাঁধ পড়লে অনেক গ্রাম ডুবে যায়। আমি এ কথা ক্যান্টনমেণ্টে শুনেছি।

—তা কি হতে পারে?

—জানি না।

সুরজ তার নতুন বউ, ভালবাসার বউকে রেখে ফিরে যায়। তার কিছুদিন বাদেই মাটা গাগরাই অসুখে পড়ে। সুরজের মাকে ডেকে বলে, সেবার সুরজের সঙ্গে দেখা হবার জন্যে বেঁচে ছিলাম। এবার আর বাঁচব না। সুরজকে খবর দিস না তুই। কাজ থেকে বারবার ছুটি নেয়া ভাল নয়।

সুরজের মায়ের কাছে এখনো চাকরির চেয়ে তার শ্বশুরের আসন্ন মৃত্যু, মৃত্যুর পরেকার কৃত্য কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

—চিঠি লিখিয়ে দিই?—সে বলে।

—না।

—সে দেখবে না? তুমি তাকে দেখবে না?

—না। তুই তো আছিস। সুরজকে দেখিস।

সুরজের মা খুব শক্ত মেয়েছেলে। সেও এ সময়ে ভেঙে পড়ে। কেঁদে বলে, আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ? সুরজকে তো আমি দেখব। আমাকে কে দেখবে?

মাটা বলে, ছি ছি গঙ্গা ! সুরজের মত ছেলে থাকতে তুই এ কি বলছিস ? সে দেখবে।

তারপর বলে, আমাকে জিয়াতাতারা ডাকছে। তুই আমাকে আমার ছেলের কাছে দিস।

জিয়াতাতা তো পূর্বপুরুষ। তারা ডাকছে মাটা গাগরাইকে, যার আরেকটা নাম সুরজ আর সারা জীবন যে "মাটা" নামেই পরিচিত হয়ে থাকল ?

—ছেলে যদি হয় সুরজের, নাম দিস সিংরাই। আর মেয়ে হলে তো তোর নামে তার নাম হবে গঙ্গা।

—সিংরাই ?

—হ্যাঁ। সিংরাই। আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। কালু আমাকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে।

এ কথা বলেই পাশ ফেরে আর চোখ বোঁজে মাটা গাগরাই। ওর আসল নাম সুরজ, আর সে জন্যেই ওর নাতির নামও হয় সুরজ। ওর ছেলের নাম ছিল শুক্রাম। কিন্তু ও বলে যে সুরজের ছেলে হলে নাম দিতে হবে সিংরাই। কত বছর বাদে ও বলল, "গঙ্গা"। সুরজ জন্মাবার পর থেকে গঙ্গাকে কেউ স্বনামে ডাকেনি। ও তো সুরজের মা।

গঙ্গা নান্দিকে বলে, তোর বাবাকে ডাক্।

নান্দির বাবা আসে। গঙ্গা বলে, কোন ছেলেকে কালী গ্রামে পাঠাও। সুরজের তাতা বুঝি আর থাকে না। ওর ভাইপো আসুক।

খুব জ্ঞানী, বিবেচক আর সুধী মানুষের মত মরে মাটা গাগরাই ওর ভাইপো এসে পৌঁছবার পর। গ্রামের সবাই চলে আসে। তেল-হলুদে মৃতকে স্নান করানো হয়। পরানো হয় নতুন কাপড়। মৃতের হাতে এক মুঠো ধান দেয়া হয় আর নেয়া হয়। তিন বারের বার সেই ধান নতুন কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে রাখা হয়। আগামী বছর এই ধান ছড়িয়ে বীজ বোনা শুরু হবে।

তারপর সেই করম গাছটি, যা নাকি এখন সুরজের বাবা, তাকে

দক্ষিণে রেখে সমাধি খনিত হয়। মৃতের মুখে পয়সা দেয়া হয়, সমাধিতে রাখা হয় মাটার কাপড়, চাল ও ধান, একটি বাটি। তারপর শায়িত মাটার ওপর মাটি ফেলা হতে থাকে। সুরজের মা শুকনো গলায় বলে, ওই দূরের পাহাড় হতে শ্মশানডিরি এনে দিও তোমরা।

সবাই সম্মতি জানায়। মাটা গাগরাই ধনে দৌলতে বড় ছিল না। কিন্তু সে ছিল সম্মানিত, সবার প্রিয়। তার মত কেউ জানত না এ তল্লাটে কোলহানের প্রাচীন ইতিহাস। তার কাছে সে সব কথা শুনেছিল বলেই হয়তো তার ছেলে "কোলহান্ ক্রান্তি দল" যারা গড়েছিল, তাদের সাথে যোগ দেয়। সেও অনেকদিনের কথা। তবু এ গ্রামের লোকগুলি সে সব কথা ভোলে নি।

হ্যাঁ, ওরা দূরের পাহাড় থেকে আনবে সমাধি পাথর। যত দূর থেকে যত কষ্ট করে আনা যায়, তত বেশি সম্মান দেখানো হয় মৃতকে। সুরজের বাপ তো গ্রামে মরে নি। তার সম্মানার্থে গ্রামবাসী পায়ে চলা পথের ধারে একটি পাথর বসিয়েছিল।

সুরজের মা'কে ওরা আজ যেন নতুন চোখে দেখে। বিধবা হবার সময়ে ও তো উনিশ বছরের মেয়ে। কোনো দিকে হেলেনি টলেনি। কোমরে হাঁসুয়া নিয়ে ঘুরত। জঙ্গলবাবু তো ওকে কত গয়না-কাপড় দিতে চেয়েছিল। ও বলেছিল, আমি ছিলাম শূর বীর মানুষের বউ। গহনা, কাপড়ের লালচে সে ইজ্জত খোয়াতে পারব না। আমি তেমন কাজ করলে আমার স্বামীর নামটা ছোট হয়ে যাবে।

মাটার মৃত্যুর খবরটা বয়ে একটা চিঠি সুরজকে বনৌলি থেকে নালন্দা, তারপর দানাপুর, দানাপুর থেকে ভুরাণ্ডা ধাওয়া করে বেড়ায়। সমাধিতে দেবার পাথরটি এনে রাখা হয়। নয় মাস বাদে টাটানগরে এক বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের সময়ে প্রজ্জ্বলন্ত কুলিধাওড়া থেকে আগুনবন্দী দুই বুড়োকে বাঁচিয়ে সুরজ নিজে যথেষ্ট পুড়ে যায়। প্রশংসিত হয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরেও ও ছুটিতেই থাকে। সে সময়ে ও বাড়িতে আসে।

এখন যথেষ্ট ধুমধামে মাটা গাগরাইয়ের সমাধিতে পাথর দেয়া হয়। সে উপলক্ষে যথেষ্ট ডিয়াং পান করা হয়, হৈ চৈ লেগে যায়।

সুরজের বিস্ময় আর কাটে না। তাতার অসুখ গেল। সে মারা গেল। তার পারলৌকিক হল। অথচ মা বলে, ধার হয়নি। কেমন করে সব হল? জমি পাঁচ বিঘা যেমন, তেমনি তাতে তো একবার গেরো ধান হয়। তা থেকে কতটা কি হওয়া সম্ভব?

মা সগর্বে বলল, নান্দি তোর কাকার কাছে একটা বাছুর পালনি নিয়েছে। আর এই এক বছরে ও ছাগল চরিয়েছে, হাটে পাঁঠা বেচেছে। আর সাহস করে কুরথি কলাই চাষ করিয়েছে। তাও বেচেছে। তোর পাঠানো টাকা সব জমানো আছে। তা থেকে মোষ আমরা কিনবই।

—তুমি তো ঘরের পাশেও শাক, বেগুন, লংকা লাগিয়েছ দেখছি।

—সব ও করছে। কুয়ো থেকে বাঁকে জল আনে আর ঢালে। এবার লংকাও বেচবে।

—খুব বুদ্ধি করেছে।

—তা তো বটেই।

সুরজ খুব খুশি হয়। মনে শান্তি আসে ওর। নান্দিকে বলে, আমার জন্যে তোর কষ্ট হত?

—হত বই কি।

—দেখে তো মনে হচ্ছে না।

—দেখে তুমি কতটা বুঝবে?

নান্দিকে অবাক হয়ে দেখে সুরজ। বলে, তুই খুব সুন্দর হয়েছিস।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, খুব সুন্দর।

—শহরের মেয়েদের থেকে সুন্দর।

—সব মেয়েদের থেকে।

সুরজ সব কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। হো মেয়ে কি শহরের

মেয়েদের মাপে সুন্দরী হবে ? নান্দির মত নিকষ কালো রং, পাতলা শরীরে ভরাভরন্ত বলিষ্ঠ গড়ন, মুক্তোর মত দাঁত আর রুক্ষ ঘন চুল কয়টা মেয়ের আছে ? সুরজ নান্দিকে বুকে টেনে নেয়।

চলে যাবার পথে সুরজ কালু সুমরাইয়ের সঙ্গে দেখা করে। কালু সুমরাই বলে, আবার তো চুনাও আসছে। রাওল সাহেবকে ভোট দিয়ে আমরা খুব ভুল করেছি। সে আদিবাসীদের দুঃখ কিছু বুঝল না।

—তার নিজের নাফা কেমন হচ্ছে ?

—খুবই ভাল। কেরাবনিতে যে সিমেন্ট কারখানা হচ্ছে, সেটা ওরই, তবে বেনামে। শুনছি যে, ধানবাদে কয়লা-খাদানও কিনেছে। এত তাড়াতাড়ি এত টাকা করছে যে সে জন্যে ফেঁসেও যেতে পারে।

—ইলাকায় রাস্তাঘাট, নতুন হাসপাতাল, কিছুই তো হয়নি।

—একটা কুয়া কাটিয়ে দেয় না, ও বানাবে রাস্তাঘাট আর হাসপাতাল ?

—আদিবাসী ইলাকা। টাকা মঞ্জুর থাকেই।

—মঞ্জুরও হয়, টাকাও আসে।

—ও খেয়ে নেয়।

—ও খায়, অফিসার খায়। দেখ সুরজ। আমাদের মধ্যে তেমন দুরন্ত কোন লোক থাকলে ঠিক সে ভোট পেত আর জিতে যেত।

—আপনি কেন দাঁড়ান না ?

—আমি ?

—হ্যাঁ, মাস্টারজী।

—তোমার মত ছেলে যদি ধরো দেশে ঘরে থাকত, তবে তাকে দিয়ে ভরসা ছিল।

—দেশে পড়ে থাকলে আমিও মোষ নিয়ে জমিতে গেরো বুনতাম আর বনে যেতাম কাঠ আনতে। তখন কোন ভরসাই থাকত না আমার ওপর।

—তোমার কথাও ঠিক। আর এ কথাও ঠিক যে, আমিই তোমাকে ফৌজে নাম লিখাতে বলি।

সুরজ খুব আন্তরিক সততায় বলে, আমি এখনো ছেলেমানুষ, আপনার মত বুদ্ধিও আমার নেই। আদিবাসীদের দরকার ভাল আর লড়াকু আদিবাসী নেতা। সে কাজ আপনিই পারবেন। যারা কাংরেসী দলের মদতে নেতা হয়েছে সেই দলীপ জোংকো, চাই লালবাবা তিরকের সঙ্গে দেহাতের গরিব আদিবাসীর কোন যোগাযোগ নেই।

—সে কথাও সত্যি।

—আপনি তো পরব-পূজায় গ্রামে গ্রামে যান। পাহাড়িয়া জংলী আদিবাসী লোক তো বিপদ-আপদে আপনার কাছেই আসে। ওরা আপনাকে ঠিকই বলবে যে, চুনাও লড়াইয়ে নামলে আপনার সম্ভাবনা কেমন। ওরা তো মিছে কথা বলে না।

একথা বলে কালু সুমরাইয়ের মনে একটা অসম্ভব আশার আগুন জ্বেলে দিয়ে চলে যায় সুরজ। এর ফলে যা যা হয়, তার সঙ্গে সুরজ গাগরাইয়ের কাহিনীর মিল আছে কি নেই, তা যে যেমন বুঝবে, সে তেমন বুঝুক।

সার্জোম-বাহা বা নতুন ফুল-পাতার বসন্ত উৎসব কোলহানে বসন্ত সমাগমে এখানে-ওখানে হয়ে চলে। শাল গাছে নতুন ফুল ফুটলে তবে হয় বাহা পরব। এ পরবে গ্রাম-দেবতার পূজা হয় শাল ফুলে, ডিয়াঙে, মুরগী বলি দিয়ে। বাহা পরব না হলে শালপাতার থালা বাটি তৈরী করতে নেই, খেতে নেই মহুয়ার ফল-ফুল, কোন জংলা ফল।

এ পরবে হো মেয়েরা চুলে শালফুল পরে নাচে, গান গায়। এ গ্রামের পরব শেষ হলে ও গ্রামে বাজে বাঁশি ও নাগারা।

কালু সুমরাই এ সময়ে ছুটি নিয়ে গ্রামে গ্রামে যায়। এবার বাহা পরবের আগেই হঠাৎ নেতৃত্ব দিতে হল।

সিমঝেরা পাহাড় ও নীচের শালবন কোলহানের এ অঞ্চলের লোকদের কাছে অতি পবিত্র বলে গণ্য হয়। হো জাতির সবচেয়ে

বড় পরব মাঘে পরবে, এখানে তারা এক সুপ্রাচীন শাল গাছকে নতুন ধান, ফুল ও মুরগী বলি দিয়ে পূজা করে, তবে গ্রামে পরব শুরু করে। তাদের বিশ্বাস, যতদিন এই পাহাড়, বন ও গাছটির পবিত্রতা থাকবে, ততদিনই কোলহানের সন্তানদের ভরসা। একদিন আবার তারা প্রাচীন গৌরব ফিরে পাবে।

এই জঙ্গল ও পাহাড় রামপুর জঙ্গলমহালের অন্তর্গত। কিন্তু হো জাতির মনে জায়গাটি খুব পবিত্র বলে গণ্য। তাই এখানে কেউ ঢোকে না। এখানে কেউ গাছ কাটে না।

বাহা পরবের আগেই দুটি থানার পঁচিশটি গ্রামের লোক ভীষণ উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। রাওল সাহেব সিমঝেরা পাহাড়ের শালবন ডেকে নিয়েছে ও গাছ কাটার তোড়জোড় করছে। তারা অসম্ভব বিপন্নবোধ করে ও কালু সুমরাইকে বলে, এ কেমন কথা হল? তুমি ওখানে বসে আছ, কিছুই জান না?

—সত্যি জানি না।

—এ কেমন করে বন্ধ করা যায়?

—বন্ধ তো করতে হবে।

বুড়োরা বলে, 'করতে হবে' তো বলছ। ওদিকে রাওল তো জঙ্গল ডেকেছে বেনামে, জালি কোম্পানীর নামে। এ কাঠ ব্যবসায়ী কোম্পানীর নাম 'জয় মহাবীর' কোম্পানী আর কোম্পানী তো কুলি-টুলি নিয়ে সেখানে যাচ্ছে। এখন কেমন করে রুখবে?

—রাওলের কাছে যাব। গ্রামপ্রধানদের নামে ডিপটিশান লাগাব।—

—বলো বলো! লিখি পড়ি লোক তুমি কি বল তা শুনতে চাই।

বুড়োদের চোখে মুখে থাকে তেতো বিদ্রূপের হাসি। কালু সুমরাই খুব বিব্রত হয়।

—দেখ! প্রতিবাদ জানাবারও তো নিয়মতরিকা আছে একটা, তাই তো জানি।

যেসব বুড়ো কালু সুমরাইকে লিখিপড়ি আদ্মী, মাস্টারমানুষ

বলে বরাবর বহোত মানগিরা দিয়ে এসেছে, তারাই এখন বলে, নিয়মতরিকাও মানা হবে, সবই হবে, শুধু সব সেরে-সুরে যখন মনটি দেবে, দেখবে যে সিমঝেরার জঙ্গল খতম। পাকা পাকা শাল গাছ, ওরা লালচে মরে।

—কার নামে ডাক উঠেছে?

—চেরো গ্রামের চাঁদ গাগরাই।

—যে নামে মানুষ নাই?

—না।

কালু মুমরাই নিয়েছে মন ঠিক করে। বলে, তোমার নাম কি? তোমাকে বলছি।

—আমি মহন তিগ্গা।

—ওরাওঁ?

—এই আমরা ছয় ঘর আছি।

—চলো। চাঁদ গাগরাই হবে চলো।

—চাঁদ গাগরাই হব?

—হতে হবে। ঘাড়ে বাঘ পড়েছে যখন, তখন দরকারে হতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে নাগরা দাও।

—নাগরা দেব?

—নাগরা দাও। জঙ্গলে চলো।

সিমঝেরা জঙ্গলের দিকে পাঁচিশটি গ্রামের আদিবাসী পুরুষরা নাগরা বাজিয়ে তীর ধনুক নিয়ে এগোয়। দৃশ্যটি খুবই অদ্ভুত ও ভয়ংকর। ওরা হেঁকে বলে, চাঁদ গাগরাই জঙ্গল ডেকে নিয়েছে, এ জঙ্গলে কুঠার হানে কে?

ঠিকাদার ও তার কুলিরা এ দৃশ্য দেখে খুবই ঘাবড়ে যায় এবং তারা পালায়।

খবর যায় রাণ্ডল সাহেবের কাছে। সেখান থেকে থানায়। পুলিশ আসে। আসে জঙ্গলবাবু। আদিবাসীরা এখন পিলপিল করে এসে পড়ে। হাটবার ছিল, তাই ওদের এসে পড়তে কোন

অসুবিধে হয় না। চারটি সেপাই এবং অগণিত কালো কালো মানুষ। কালু সুমরাইকে চেনা যায় না। সে জামা ছেড়ে, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে একটা গাছের ডালে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, আমাদের পবিত্র পাহাড় ও জঙ্গল রাওল সাহেব জালি কারবার করে ডাক করিয়েছে। চাঁদ গাগরাইয়ের নামে ডাক উঠেছে তো চাঁদ গাগরাই হাজির। চাঁদ গাগরাই দেবে না তার জঙ্গল কাটতে।

রাওল সাহেব হেঁকে বলে, কালু সুমরাই জালি কাজ করছে। চাঁদ গাগরাই এখানে নেই।

—সে কোথায়? চেরো গ্রামের চাঁদ গাগরাই?

ভাই সব। চেরো গ্রামে তো চাঁদ গাগরাই নামে কোন মানুষই নেই। তবে সে এখানে থাকে কি করে?

রাওল এ কথা বলে অত্যন্ত বিপাকে পড়ে। তখন কালু বলে, দেখ দেখ দিকু কারবার। চেরো গ্রামে চাঁদ গাগরাই নামে কেউ নেই তা জেনেশুনে ভূয়া নামে জঙ্গল ডেকে নিয়েছে কে! আর বেনামী কোম্পানী লাগিয়ে আমাদের দেবতা পূজার জঙ্গল কাটতে এসেছে কে! আদিবাসীর দেব-দেবতা মানে না এমন লোককে তোমরা মায়লে বানিয়েছ। এই লোক আদিবাসী উন্নয়নের টাকা, হাসপাতালের টাকা, সব মেরে নিজের পেট মোটা করছে। এখন আদিবাসীর দেব-দেবতার ওপরেও কুড়াল তুলেছে।

এ কথায় ভীষণ হট্টগোল জাগে।

—ভাগাও ওদের, মেরে ভাগাও।

বিপদ বুঝে রাওল হাতজোড় করে। চারদিকে মানুষ আর মানুষ। এরা টাঙি ওঠালে নামালে পুলিশের সাধ্য নেই যে, নিজেরা বাঁচে বা তাকে বাঁচায়। এরাই তাকে ভোট দিয়েছিল। মায়লে হয়ে, রাওল সাহেব হয়ে এদের সামনে হাতজোড় করা মানে তো হার মানা। পরাজয়ের লজ্জায় তার চোখে জল এসে যায়।

—মাপ করে দাও।

—মেনে নিচ্ছ যে, ভূয়া নামে জঙ্গল ডেকেছ? চাঁদ গাগরাই কটা ভূয়া নাম?

—মানছি।

—এ জঙ্গলে কুড়াল চালাবে না?

—মানছি।

—এ তো সব মেনে নিচ্ছে।

একজন চেঁচিয়ে বলে, মায়লেকে ছেড়ো না। ও গিয়ে আ
পুলিশ আনবে। গুলি চালাবে।

—না। কথা দিচ্ছি যে কিছু করব না।

—সিমঝেরা জঙ্গলে পাহাড়ে আদিবাসীর দেব-দেবতা থাকে
তুমি জান না?

—জানি। ভুল হয়েছিল।

—যাও, ওকে ছেড়ে দাও।

ওরা চলে যেতে থাকে। হাট করতে এসেছিল যে মেয়েরা তা
হেঁকে বলে, পালাও পালাও তোমরা। নয় তো ভেলুয়াব তে
আনতে যাব।

ভেলুয়ার তেল মলদ্বারে ঢুকিয়ে দিলে তার জ্বালা সারতে তি
দিন লাগে। মায়লে, পুলিশ, জঙ্গলবাবু সব পালাতে থাকে
মায়লের গাড়িতে উঠে জঙ্গলবাবু খেঁকিয়ে বলে, দেব-দেবতার জঙ্গ
কেটে আপনি কি এই জংলী জায়গায় আগুন লাগাচ্ছিলেন? এ
কি তামাশা?

রাওল গুম হয়ে থাকে।

এই এক ঘটনায় কালু সুমরাই মস্ত নেতা হয়ে যায়। আর স্কু
ছেড়ে দিয়ে কালু সুমরাই 'কোলহান রক্ষা দল' গড়ে ফেলে।
এখন নেতা। যদিও কোলহানকে কিভাবে রক্ষা করবে, কিসে
হাত থেকে রক্ষা করবে, সে বিষয়ে তার কোন ধারণাই থাকে না।

কোলহানের জঙ্গল কাটাই নিয়ে সে অবশ্য খুব লড়ে। বন যখ
কাটবে, তখন সরকারী মজুরী দাও। এক টাকাতে দশ ঘণ্টা কা
কেউ করবে না।

এ লড়াইটা খুব জমে। এ লড়াইটা চালাতে চালাতেই কালু
কাছে আসে অঞ্চলের সবচেয়ে বড় কাঠ চালানের ঠিকাদার বর্

প্রসাদের প্রস্তাব। কালু সুমরাই আদিবাসীদের ভাল করার চেষ্টা করছে। এ খুব ভাল কাজ। তবে জঙ্গল কাটা বন্ধ রেখে তো আদিবাসীদের ভাল করা যাবে না। কালু সুমরাইকে সে দশ হাজার টাকা দিচ্ছে। আর কাঠ চালানের লাইসেন্সও করিয়ে দিচ্ছে। যত পরিশ্রম করছে কালু, এটুকু তার পাওনা।

কালু এ প্রস্তাবে 'না' বলে। এবং এই 'না' বলার ফলে তার প্রভাব এখন দাউ দাউ করে ছড়ায়। কালু তার নমিনেশন দাখিল করে।

বদ্রীপ্রসাদ ও অন্যান্য ঠিকাদাররা জঙ্গল কাটাই মজুরি এক টাকা আরো বাড়ায়। বিশাল জিত। কিন্তু তার পরেই 'কে বা কাহারা' কালুকে সাইকেল থেকে নামিয়ে ভীষণ মেরে অজ্ঞান করে রেখে যায়। 'কোলহান রক্ষা দল'-এর কর্মীদের ধরতে থাকে পুলিশ। কালু হাসপাতালে দীর্ঘদিন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। নির্বাচনে গ্রামের পর গ্রাম মোটেই অংশ নেয় না। তবু কেমন করে যেন রাওলই জেতে।

কোলহানের সন্তানরা অত্যাচারের নিষ্পেষণে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে। আর এমনি করেই তাদের মধ্যে তৈরী হয় কয়েক বছর পরেকার অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রস্তুতি।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কালু সুমরাই কিছুকাল স্বগ্রাম বানোতে বসে থাকে। 'কোলহান রক্ষা দল' এখন ছিন্নভিন্ন। তার শরীরও খুব দুর্বল। আদিবাসীরা তাকে বলে, কিছু না কিছু তো করো। না করলেও মার খাব, করলেও মার খাব।

—হ্যাঁ। কিছু না কিছু নিশ্চয় করব।

—কি করবে?

—বহোত ভেবেছি।

—সংগঠন কি ভেঙ্গে গেল?

—কৈসে?

—তুমি তো বসে গেলে?

—শালা তোমরা খুবই হারামি আছ। বসে যাওয়াটা দেখলে,

আর এটা দেখলে না যে আমার শরীরেও যত জখমের দাগ, যত হাড়গোড় ভাঙা, পুলিশের খাতাতেও অমন লম্বা ফিরস্তি আমার দাগাবাজীর। আরে! এখন তো আমি গ্রামে ইনটার্ন্নি।

হাঁ হাঁ, ইনটার্ন্নি কি জিনিস?

—গ্রাম থেকে বেরোনো বারণ।

—তাহলে?

কালুর ডান ভুরুর ওপর থেকে মাংস ঝুলে এসেছে। সে বাঁ চোখটি মটকে বলে, এখন তিন মাস গ্রামে বসে থাকলে ইনটার্ন্নি অর্ডার উঠে যাবে। তখন আমাকে কে রোখে? আর এখনো কাজ আছে।

—কি করবে?

—বানোর আশপাশে স্কুল নেই। একটা স্কুল তো শুরু করি। কম সে কম নবীন ঝারাকে পাঠাও। সে খানিক দূর পড়েছিল।

—সে কি করবে?

—স্কুল চালাবে আমার সঙ্গে। স্কুলটা মঞ্জুর করাতে পারি তো ভালো।

—একটা কথা শুধাব?

—শুধাও।

—তুমি গেরুয়া ধুতি পরে আছ কেন?

—ভাইয়া, এতে তো ময়লা বোঝা যায় না।

—চুল লম্বা লম্বা, সাধুর মত দেখাচ্ছে।

—মাথায় বড় বড় ঘা। পুরা শুকায় নি।

বানো গ্রামে কালু সুমরাইয়ের স্কুল বেশ চলতে থাকে। কিছুদিন বাদে থানা থেকে দারোগা দেখতে আসে। বি ডি ও আসে। বলে, এই তো কাজের মত কাজ। তুমি মাষ্টার ছিলে, মাষ্টারী করো। তোমার কি শোভা পায় ছোটলোকদের মারদাঙ্গার কাজে জোট বাঁধা?

—স্কুলটা মঞ্জুরী করার কি হবে?

—দরখাস্ত দাও, দেখা যাবে।

কালু সুমরাই গভীর ধূর্তামিতে সে দরখাস্তের এক কপি মোহন তিরকের কাছেও পৌঁছে দেয়। সঙ্গে আলাদা চিঠি দেয়, বানোর আশপাশে আসলে কোনও স্কুলই নেই। অথচ কাগজে রেকর্ড, এলাকায় দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে। দুটি মঞ্জুরীকৃত স্কুলের মাস্টারই রামপুরে দোকান চালায় এবং মাইনে, আদিবাসী ছাত্রদের অনুদান নেয়। মোহন যেন সম্ভব হলে এসে দেখে যায়।

মোহন তিরকে কালু সুমরাইকে দেখে কি বলবে এবং তার জন্যে কি করবে তা ভেবে পায় না। সে বলে, ধরো এখানে স্কুল মঞ্জুর হল, তুমি কি শিক্ষকতা করবে? না আবার মারদাঙ্গা করতে যাবে?

কালু সুমরাই বলে, তুমি হলে, সাচাসাফাই লোক। একটা কথা বলো আমাকে। আমি যা করেছিলাম তা কি বেঠিক কাজ, না ঠিক কাজ? সেই কথাটা বলো।

—আপিসের চেয়ারে বসে থাকলে বলতে হত বেঠিক কাজ। কিন্তু আদিবাসীর কাছে যে জঙ্গল ও পাহাড় পবিত্র, সেটা নষ্ট হতে দাওনি। সে কাজটাকে তোমার উঠানে বসে কেমন করে বেঠিক বলি?

—ঠিক কাজ মনে কর?

—হ্যাঁ, মনে করি।

—মারদাঙ্গা করিনি।

—না, করনি।

—তবু আমি মার খেলাম।

—'কোলহান রক্ষা দল' করেছিলে। ও সব নামকে ওরা ভয় পায়। ওরা তো চায় না যে কোলহানের সন্তানরা কোলহানকে রক্ষা করুক। এ দেশের সবাই তো ওদের।

—সে জানি। কিন্তু বলতে পার তুমি, এ রকম আর কতদিন চলবে?

—এ রকমই চলবে বলেই তো মনে হয়।

—কিন্তু কেন?

—কেন চলবে না তাই বলো।

—কোলহানকে এমন করে বেচে দিল কে ?

—জানি না।

—আদিবাসী সমাজে অফিসার তুমি। তোমার মত কয়েকজন থাকলে আমাদের তো সুবিধে হবার কথা।

—কালু! তুমি তো লেখাপড়া খানিক শিখেছ। তুমি বুঝতে পার না যে, আমরা আদিবাসী অফিসাররা, কত ভয় পাই আদিবাসীর কথা বলতে, তাদের জন্যে কিছু করতে ?

—কেন ভয় পাও ?

—প্রথমত আমরা সংখ্যায় খুব কম। আর এ রাজ্যে বর্ণহিন্দু বড় অফিসারও যখন আদিবাসী-হরিজন, গরীবদের ভালো করতে যায়, মন্ত্রীদের বিষনজরে পড়ে। আদিবাসী অফিসার সে কাজ করতে গেলে, অন্যদের বিষ নজরে পড়ে। আমার সার্ভিস রেকর্ডে যে কত খারাপ রিপোর্ট ঢুকে গেছে তা তুমি ভাবতে পারবে না।

—খানিকটা বুঝি।

—স্কুলটা মঞ্জুর করানো যায় কিনা দেখছি। আরে আদিবাসী এলাকায় আদিবাসী ছেলেদের মাস্টারের চাকরি অবধি দেবে না, এই তো চলছে।

—খুব খারাপ জমানা চলছে।

—একটা কথা শুনেছ ?

—কি ?

—চেরো বাঁধ প্রকল্প হবে বলে কথা চলছে। যা কথা হচ্ছে সবই ভাসাভাসা। তবে কোনদিন যদি হয়, তাহলে বিহার আর ওড়িশার দুই লক্ষ একর রুখা বাঁজা জমিতে চাষ হবে।

—সে তো খুব ভাল কথা।

—আর চাইবাসা, টাটানগর, রাজনগর ইলাকায় পঞ্চাশ-ষাটটা গ্রাম যাবে জলের তলায়। ওই সিমঝেরা পাহাড় আর জঙ্গলও যাবে।

—সে কি কথা।

—এই তো কথা কালু।

—কবে হবে ?

—আরে বহোত ঢাক-ঢোল না বাজলে কি দেবতার পূজা হয় ? এমন কথা হচ্ছে। আগে সব বড় বড় লোক আসুক, জায়গা দেখুক—

—দেখতে দেব না আমরা।

—কালু! যারা আসবে তারা ভারত সরকারের আদরের দুলাল একেক জন। তাদের মাইনে, আনুষঙ্গিক টাকা, বাড়ি ভাড়া, গাড়ির খরচ, এতে যা টাকা খরচ হয় প্রতি মাসে, তাতে এই এলাকায় সোনা ফলানো যায়।

—সত্যি ?

—সত্যি।

—আমরা একটা কুয়া পাই না!

—এরা কি এই জংলী দেশে আসবে ? এরোপ্লেনে চেপে আসবে পাটনায়, থাকবে বড় হোটেলে, লাখ টাকা খরচ হবে। তারপর ম্যাপে জায়গা দেখে নেবে। দেখে চলে যাবে।

—তারপর ?

—এরা বলবে যে হ্যাঁ, চেরো বাঁধ হতে পারে। তখন আসবে অন্য অন্য লোক। কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ জমি-মাটির পণ্ডিত, কেউ বা চাষবাস পণ্ডিত, সব দফায় দফায় আসবে যাবে। এমন চলতে থাকবে বছর বছর।

—কতদিন ?

—অনেক বছর। শেষ অবধি বিলেত কি আমেরিকা থেকে কোন পণ্ডিত ইঞ্জিনীয়ার এসে বলবে যে, এমনি করে বাঁধ বানাও। সে কোটি কোটি টাকার ব্যাপার হবে।

—তার দেরী আছে ?

—মনে তো হয় তাই।

—কালু সুমরাই চেয়ে থাকে সামনের দিকে। রুক্ষ অফলা

জাম, কংকালসার গরু। নেংটি পরা রাখাল। তারপর সে নিঃশ্বাস ফেলে বলে—জীবনকালে ওই বাঁধ হয়তো দেখে যাব না।

—দেখে যেতেও পার। তোমার বয়স তো বেশি হয়নি। অন্তত মরবার বয়স হয় নি।

—যে মার খেয়েছি তখন, তাতেই মনে হয় আয়ু কমে গেছে। সে যা হোক, এ এক মস্ত ব্যাপার। আমার মাথায় ঢুকছে না কিছু। জোয়ানরা এ নিয়ে নিশ্চয় লড়াই করবে সেদিন।

—কে জানে?

—গ্রামগুলো অমনি ডুবিয়ে দেবে?

—টাকা ফেলে দেবে নিশ্চয়।

—টাকার কথা বোল না। ও সব আমার জানা আছে। রাঁচিতে যখন হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং হল, তখন কত গ্রাম গেল?

—অনেক।

—সে সময়ে তো মাথা পিছু না হলেও ঘর পিছু বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। ওটা তো জালোম ফান্দা। বল দেখি তুমি! যে আদিবাসীর ঘরের জন্যে এত টাকা কেন মঞ্জুর হয়েছিল বলতে পার? আমি জানি, অত টাকা দেয়া সাব্যস্ত হয়েছিল এই কারণে যে যাদের ঘর তারা পাবে পঞ্চাশ কি একশো টাকা। স—ব টাকা যাবে তাদের পেটে, যারা আদিবাসী নয়। যারা দালাল আর জোচ্চোর।

—এরই নাম আদিবাসীর জন্য ক্ষতিপূরণ।

—চেরো বাঁধ হলেও তাই হবে।

—হয়তো।

কালু সুমরাই এক আদিবাসী প্রাক্তণ শিক্ষক। মোহন তিরকে এক অফিসার। কালু সুমরাই কোনদিন ধনী ছিল না। এখন তো তার ঘরের চালে খড় জোটে না। তার পরনে গেরুয়া ছোপানো জীর্ণ ধুতি, শরীর দড়ি দড়ি। মোহন তিরকের পরনে টেরিকাপড়ের প্যান্ট ও জামা, হাতে ঘড়ি। সদর শহরে মোহনের স্ত্রী গীতা তিরকে স্কুলে শিক্ষিকা, ওর সরকারি বাড়ির সামনে এক ফালি বাগানও আছে।

কিন্তু এখন কেমন করে যেন দুটি আদিবাসীর মন মিলে যায়—ব্যর্থ দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ, হতাশা। মোহন বলে, সিংভূম জেলাতে আদিবাসীর সংরক্ষিত কাজ ওরা করে, আদিবাসীর জন্যে তৈরি কলোনীতে ভাল বাড়ি ওরা নেয়। বাজার দোকান ওদের হয়। আদিবাসী উন্নয়নের সব টাকা ওদের, আর আদিবাসী তার গ্রাম-ঘর থেকে উচ্ছেদ হলে ক্ষতিপূরণও ওরাই পায়। এর নাম সিংভূমে স্বাধীনতার তিরিশ বছর। আমি চলি কালু। ভাল থেকো। খবর দিও।

যাবার আগে মোহন তিরকে বলে, অলগখণ্ড আন্দোলনের হাওয়াটা ওদিকে বেশি বইছে। এদিকে এলে এলাকা জেগে যেত। কি হবে তা জানি না, তবে অলগখণ্ড মুক্তিমোর্চার হাওয়া খুব জোর। সরকারও ভয় পায়।

—হাওয়া যদি সাচাই হয় তবে আসবে নিশ্চয়।

—হাওয়া তো আসে না, তাকে আনতে হয়।

—এ কোনো অফিসারের কথা হল ?

—আদিবাসীর কথা হল।

কালু মুমরাই মোহনের পিঠে হাত রাখে। বলে, তুমি বহোত একলা পড়ে গেছ মোহনজী।

॥ তিন ॥

অলগখণ্ডের হাওয়া কিন্তু ছড়াচ্ছিল। অনেক দূরে দূরে চলে যাচ্ছিল খবর। খবরগুলি কোলহানেব সন্তানরা তেমনি করে গ্রহণ করছিল, যেমন করে কোলহানের মাটি গ্রহণ করে বৃষ্টির জল।

আর "অলগখণ্ড" নামের পিছনে একে একে দাঁড়াচ্ছিল, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল কোলহানের সন্তানরা।

সত্তরের দশকে। কোলহান ক্রান্তি দল, কোলহান রক্ষা দল, কোলহান সেনা সংঘ, এমন সব নামের যে সব ছোট ছোট সংগঠন সময়ের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে আর বন্দুক বনাম তীর ধনুকের অসম লড়াইয়ে হেরে গেছে বারবার, তারাও অলগখণ্ডের নামে আবার জোট বাঁধছিল। শাল কেটে সেগুন লাগাবার ব্যাপারে অলগখণ্ডের সঙ্গে সরকারের লড়াইয়ে বন্দুক চলছিল।

কেন চলবে না বল?

শাল গাছ থাকলে কিউবিক ফুটের হিসাবে শালের দাম তুলনায় কম। সেগুনের দাম বেশি।

শালের চেয়ে সেগুনে সরকারের লাভ বেশি। কিন্তু কোলহানের গরীব অদিবাসী ও অ-আদিবাসী মানুষদের ষোল আনা লোকসান।

শাল ওদের গরামদেবতা। শালের পাতা, ফুল, ফল, বীজ, ছাল ও কাঠ ওদের হাজার উপায়ে পেটের খিদে মিটায়। হাজার কাজে লাগে। বনভূমিতে শালের অবস্থান স্নেহশীল কর্তাব্যক্তির মত। শালবনের মাটিতে লালিত ও পুষ্ট হয় নানান ঝোপড়া গাছ। লতা, আর কন্দে-মূলে-ফলে গরীবের খিদে মেটে।

সেগুন হল স্বভাবে জমিদার। সে যে বনে জন্মায়, তার মাটিতে আর কোনো গাছ-লতা-ঝোপ থাকতে পারে না। জমিদারের কাছে কি সাধারণ লোকজন ঘেঁষতে পারে?

বানঝারা, পোড়ো পতিত জমিতে সেগুন লাগাত সরকার। বন তৈরি করত, তাতে বলার ছিল না কিছু।

কিন্তু শাল কেটে সেগুন লাগাবে কেন? কেন অন্যায় করে আদিবাসীদের নিজস্ব বন, খুঁটকাট্টি বনে শাল গাছ কাটবে আর সেগুন লাগাবে?

এই নিয়েই লাগে অলগখণ্ড সংঘর্ষ। আর আদিবাসীরা বলতে থাকে,

শাল আদিবাসী—

সাগোয়ানা দিকু—

সাগোয়ানা রোপাই—

বন্ধ করো॥

শাল বনাম সেগুনের লড়াই এখন আদিবাসী বনাম দিকুদের ইজ্জতের লড়াই। অলগখণ্ড নামের ঝাণ্ডা তুলে আদিবাসীরা এগোতে থাকে। এভাবেই কোলহানের বুকে সব উথালপাথাল হয়ে যায়।

কালু সুমরাইদের এলাকাতেও হাওয়া চলে আসে।

খুবই আশ্চর্য যে পল্টন বারিকে থেকেও সুরজ গাগরিয়া সব খবরই পেয়ে যায়। এর আগে সে, সমা ও মোকাম অনেক সময়েই আলোচনা করেছে একটা কথা।

তাদের এলাকায় বা কোলহানে সব সময়ে পুলিশ মিলিটারি থাকে উত্তর বিহারের। আর তাদের পাঠায় বিহারের অন্যত্র।

এখন সুরজ বলে, নিয়মটা তো অনেক ভেবে বের করেছে। আমরা থাকলে কি আর গুলি চালাতাম আদিবাসীর উপরে?

—ভাইয়া! কোলহানে তো ফৌজ নামে নি।

—নামতেও তো পারে।

মোকাম নিশ্বাস ফেলে বলল, কি যে হচ্ছে দেশে তা বোঝাই যাচ্ছে না।

সুরজ বলল, কয়েক বছর তো হল। এখন মনে হচ্ছে নিজের ইচ্ছায় রিটায়ার করে দেশে ফিরি।

—এখনি ফিরবি ?

—কেন যেন ভাল লাগছে না।

কিন্তু তখনো সুরজের আসার সময় হয় নি। অলগখণ্ডের লড়াই-গুলির খবর সে পেত, আবার সব সময় পায়ওনি। দেশ থেকে খবর এসেছিল যে নান্দির কোলে একটি মেয়ে এসেছে আর তার নামও রাখা হয়েছে গঙ্গা। কালুই চিঠিটি লিখে দেয়।

এই সময়েই হঠাৎ সুরজ বনে যায় বীর নায়েক আর মোকামের মেলে মরনোত্তর সম্মান, যখন ফৌজী বারাকে হঠাৎ তলব আসে বলরামপুর থেকে। কয়লা খাদানে ধস নেমে একষট্টিজন শ্রমিক হয় নিখোঁজ আর নিমেষে বলরামপুর হয় একদিনের জন্য জাতীয় সংবাদ।

একষট্টি জনের জীবন বাঁচাবার জন্যে বড় বড় অফিসারের অত্যন্ত আকুলতা।

কেন ?

খাদানের মুখ সৈন্য ও পুলিশে সুরক্ষিত। তারই বা অর্থ কি ?

প্রেস এসে পৌঁছাবার আগে ওদের উদ্ধার করা চাই। তাই বা কেন ?

এরা তো ঠিকাদারের কুলি আর কয়লাখাদানে ঠিকাদারই সর্বেসর্বা।

অফিসারদের মুখ দেখে বোঝা যায় যে কাছাকাছি ফৌজী বারাক থাকাটাকে তারা আশীর্বাদ মনে করছে। এখন খাদানটিকে গভীর ও কুটিল রহস্যময় বলে মনে হয় সুরজের। কিন্তু ভারতীয় জওয়ান কখনো কোন প্রশ্ন করে না। সে শুধু হুকুম তামিল করে। তাই সুরজরা নেমে যায়। জননীর জঠোরের মতই এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চাপা প্রতিহিংসার মত এখনো ধস নামছে মাঝে মাঝে। নামতেই বোঝা যায়, উপরে ওপরমহলে প্রেস বিষয়ে এমন আতঙ্ক কেন। প্রাচীন ও বিপজ্জনক খনিটিতে ছাতের সঙ্গে খুঁটির ঠেকোও ছিল না। এমন অতলে কে থাকবে জীবিত ?

চাপা কান্না শুনে ওরা চমকে ওঠে। তারপর সাড়া দেয়। বলে, আমরা আসছি। ভরসা রাখো।

একষট্টিজন সরকারী হিসেবে খাদানে ছিল। সুরজরা অশেষ চেষ্টায় বারোটি আর্ত ও মৃতপ্রায় বালককে ওপরে তোলে। খাদানের অতলে দশ-বারো বছরের বালককে নামানো বেআইনী। বেআইনী চোদ্দ বছরের নিচে কারুকে নিয়োগ করা।

আর্ত সাঁওতাল বালকগুলির মুখ সুরজের রক্তে গেঁথে যায় তীরের মত।

এখন সে ভীষণ জেদে, ক্রুদ্ধ সংকল্পে আবার নামে। জীবিত ও মৃত। দশ থেকে ষোল। বাহাত্তরজনকে ওরা তোলে এবং এবার সুরজ অজ্ঞান হয়ে যায়। কেন না প্রচণ্ড ক্রোধে আবার ধস নামে। এটা খাদানের প্রতিশোধ। এভাবেই খাদানে থেকে যায় মোকাম ও জার্নেল সিং। পরে সুরজ জানে যে সে হয়ে গেছে বীর নায়ক। তার মতো নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগীদের কৃতিত্বেই প্রায় সকলে রক্ষা পেয়েছে। মারা গেছে শুধু সাতজন। মোকাম ও জার্নেল সহ।

সৈনিকদের মেলে মরণোত্তর সম্মান। মৃতদের পরিবার পায় নগদ টাকা। অবশেষে প্রেস যখন পৌঁছয় তখন সব সাফসুতরা, একটি নিটোল কাহিনীর প্যাকেট সেলোফেনে মুড়ে পৌঁছে দেয়া হয়। যেহেতু সুরজ একাই অনেক লাশের হিসেব জানে, সেহেতু তার অনেক ছবি তোলা হয়। ছবিতে সুরজের চোখটি থাকে বেদনাহত ও গভীর। বড় কাগজের ঝানু ছোকরা সাংবাদিক ওর ছবি তোলে। বীরত্বের জন্যে অভিনন্দন জানায় ও নীচুগলায় বলে—ক'জন মরেছে ?

সুরজ একই রকম চোখে চেয়ে থাকে। সে চোখে বেদনা, বিস্ময়, ও অতল গভীরতা।

সুরজের ক্যাপটেন বলে, ওর বন্ধু এবং সঙ্গী মারা গেছে। ও কিছু বলতেই পারবেনা।

সুরজ জানে যে এ কথা মিথ্যে। সে বলতে চায় এবং বলার জন্যে তার প্রতি রক্তকণা চেঁচাচ্ছে। সুরজ এও জানে যে সে মুখ খুলতে পারবে না। কেন না প্রতিপক্ষ বড়ই শক্তিমান ও বিশাল ক্ষমতাশালী।

কয়লা এখন জাতীয়কৃত সম্পত্তি এবং কয়লার কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চালায় ঠিকাদাররা। বলরামপুরের মত বিপজ্জনক ও নিরাপত্তালেশহীন খাদান ঠিকাদার চালায় তাদের বালক শ্রমিক দিয়ে। সবাই সব জানে এবং বলরামপুরে ধস নামে। ঠিকাদার খাদানে নামায় চালানি বালকদের, ফৌজী দপ্তর নামায় জওয়ানদের। বালকদের মত মোকামরাও মরে এবং তাদের মৃত্যু হয় জাতির ও দেশের সেবায়। নানাদিকে তদন্তের দাবি ওঠে। কাগজে নিহত শ্রমিকের মায়ের কান্নায় ভেঙে পড়া মুখের ছবি ওঠে। ছবির নীচে করুণ ও মর্মস্পর্শী কয়েকটি শব্দ—"সোমরু ফিরে আসবে না।" সকালে আপিস টাইমের আগে বড় বড় পূর্বাঞ্চলীয় শহরের বহু ফ্ল্যাটে সোমরুর মা জানালা দিয়ে ঠকাস ঠকাস শব্দে সুতোয় বাঁধা হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পড়ে থাকে চায়ের টেবিলে, বিছানায়। পাখার বাতাস ফরফরিয়ে ওড়ে, আবার সোমরুর মা বিক্রি হয়ে যায় কাগজঅলার কাছে। যতদিন কাগজে লেখালেখি হয়, ঠিকাদাররা বলরামপুরগুলো বন্ধ রাখে। আবার ঠিক খুলে ফেলে মওকা বুঝে।

ভীষণ, ভীষণ ক্ষমতাশালী এ সব চক্র। সুরজ কেমন করে মুখ খুলবে এবং কেন খুলবে?

খুবই হতাশ হয়ে পড়ে সুরজ। প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট হাতে পেয়েও তার হতাশা কাটে না। আর এর পরে পরে, "কুখ্যাত" ডাকাত রাজ চৌহানকে ধরতে গিয়ে তার হতাশার ভার পরিপূর্ণ হয়।

জায়গাটি উত্তর বিহারের কৃষি অঞ্চল। সিংভূমের আদিবাসীদের কাছে, বিশেষত কোলহানের সন্তানদের কাছে "উত্তর বিহার" নামটি বড়ই আপত্তিকর। জিগ্যেস করলে ওরা বলবে, কৈসে ন হোই এইসা? পুলিশ গুলি চালায়, বহোত ঝামেলা করে, সে উত্তর বিহারের লোক। কোলহানের বুকে যারা শ্মশানের আগুন জ্বেলে

রেখেছে, যাদের ভয়ংকর ও হৃদয়হীন জুলুমের জন্যে কোলহানের সন্তানরা আজ নিজ বাসভূমে পরবাসী, সে সব ঠিকাদার-অফিসার-ইটভাটা মালিক-মহাজন-ব্যবসায়ী—অধিকাংশই উত্তর বিহারের লোক।

কোলহানের বেশির ভাগ লোকই নিজের করুণ ও শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে সচেতন হয় যখন জঙ্গলে বা খাদানে বা কারখানাতে তাদের সঙ্গে বিরুদ্ধ শক্তিগুলির সংঘর্ষ হয়।

তখনি তারা দেখে যে জুলুমবাজরা সরকারের মদত পাচ্ছে। এ রকমই চলে। ফলে কোলহানাদের মনে এ ধারণা গেঁথে বসে গেছে যে, উত্তর বিহারের লোকেরা তাদের দুশমন। সুরজও এমন ধারণা নিয়েই বড় হয়েছে। যদিও মোকাম তাকে বলত, এ কথাটা ঠিক নয়। উত্তর বিহারের সব লোক যদি চলে যায়, তাদের জায়গায় আদিবাসী তো আসবে না। কোলহানের ডাল মে কালা তো থাকবেই। এখন সেই "কালা"টা যে কি, এবং কোথায় আছে, সেটাই তো বুঝতে হবে।

আবার এ কথাও সে বলে গেছে যে কোলহানীদের বিষয়ে সরকার বহোত খচড়াই করছে বহোত দিন হল। আদিবাসী, অফিসার-ঠিকাদার-পুলিশ এলেও সরকার তাদের দিয়ে খচড়াই করাবে। কেন না এ সব অফিসারী ঠিকাদারী বা পুলিশী পেশাই হল শয়তান বানাবার পেশা।

তবু সুরজ বলত—উত্তর বিহারের লোকেরা চলে গেলেই কোলহানীদের কষ্ট ঘুচবে।

এখন মোকাম নেই। সুরজরা উত্তর বিহারে। "ডাকাত দমন করতে যাচ্ছ" এ ছাড়া কোন কথা তাদেরকে বলা হয় নি। ডাকাতের নাম রাজ চৌহান। সে নানান খতরনাক কাজ করেছে। অনেক ভাল লোককে মেরেছে। সরকারী কানুনকে বিকল করে দিয়েছে।

সুরজরা পৌঁছবার আগেই রাজ চৌহান মারা পড়ে এক খণ্ড-যুদ্ধের পর। সুরজরা পৌঁছয় এবং থানার সামনে তারা যেতে পারে না এমনই এক জনতা সেখানে।

ওরা কি ওদের দুশমনের মৃত্যুতে আনন্দ করতে আসছে? কি বলছে ওরা।

সুরজ বোঝে যে ওরা কি দাবী জানাচ্ছে।

কি সে দাবী?

বাঁশের চটার ওপর সাদা কাগজ ও খবরের কাগজ সাঁটা। তাতে লাল হরফে কি সব লেখা। এমন শত শত লেখা উঁচু করে ধরে এনেছে মেয়েরা, পুরুষরা, বালকরা।

কি লিখে এনেছে?

—রাজ চৌহান গরীবের বন্ধু।

—রাজ চৌহান অত্যাচারীর দুশমন।

—সারোয়ার ক্ষেতিহার কিষাণ মজদুর রাজ চৌহানের ঝাণ্ডা উঁচু রাখবে।

—রাজ চৌহানের লাশ আমরা নেব।

—এক রাজ চৌহান মরেছে যেই, তার রক্ত থেকে হাজার রাজ চৌহান জন্মেছে।

যা লেখা আছে, তাই ওরা বলছে এবং রাজ চৌহানের মৃতদেহ চাইছে।

এরা ক্ষেতমজুর। এরা কিষাণ। সুরজের মায়ের মত প্রৌঢ়ারা, মোকামের পিতামহীর মত বৃদ্ধারা, নান্দির মত তরুণীরা, সবাই এসেছে।

ভি আই পি লাশ কযটির দিকে তাকায় সুরজ। দুর্ধর্ষ এক খুনে ডাকাত কে? এ তো এক বছর ত্রিশের যুবক। আর দুজন তো চেহারায় কিষাণ।

জনতার ভিড় বাড়ছে তো বাড়ছেই। সুরজ এখন প্রচণ্ড আঘাতে উপলব্ধি করে এটা উত্তর বিহার। কিন্তু তার চারদিকে চাপ বেঁধে আছে, যারা সামনে আসতে চেষ্টা করছে, যারা আল বেয়ে, পথ ধরে অগণন আসছে, যাদের গায়ের ঘাম ও ময়লা কাপড়ের চিটে গন্ধ ও পাচ্ছে, তারা সবাই গরীব, ভীষণ গরীব। মেয়েরা বুক চাপড়ে কাঁদছে, বলছে—দেখতে দাও! দেখতে দাও।

এই সব গরীব, হতভাগ্য মানুষগুলিও উত্তর বিহারের। তবে কোলহানে যারা যায়, তারা তো সবাই নয়। আর খুনে ডাকু মারা গেলে গরীবের এই শোক, এই দাবীগুলি কেন? হিসেবে সব গোলমাল। স—ব গোলমাল। এবার জনতার দাবী উত্তাল হয়।

—খুনী সিপাহী সরে যাও!

—রাজ চৌহান সে হাঁথ উঠাও!

—রাজ চৌহান হামারা হ্যায়।

সামরিক অফিসার। যে আজ ভোর রাতে চৌহানকে মেরেছে, সে বলে—সবাই হটে যাও। লাশ চেরাই কাটাই হবে। সদর থেকে লাশ নিও।

জনতা শোনে না। জনতাকে সামলানো যায় না। লাঠি চালাবে? গুলি চালাবে? এ যে কয়েক হাজার ক্ষিপ্ত লোক।

সহসা বাইরে থেকে কারা চেঁচিয়ে ওঠে। লাশ উঠিয়ে নাও। রাজ-মোতিচাঁদ ঔর গোবিন্ কোরি আমাদের।

লাশ উঠাও। মেয়েরা সরে যাও।

অফিসার বলে, গুলি চালাও।

সুরজ বলে, কেমন করে? এ তো শুধু মেয়েরা আর ছোট ছেলেরা।

অফিসার ও সুরজ পরস্পরের দিকে তাকায়। এ সময়ে রাস্তার দিকে ট্রাক থামিয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে করতেই এগোয়। জনতা ও পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। বাতাসে বার বার গুলি ছুঁড়ে তবে রাজ-মোতিচাঁদ ও গোবিন্‌কে ট্রাকে তুলতে চেষ্টা করে পুলিশ। সিপাহীরা দৌড়তে চেষ্টা করে লাশগুলি ঘিরে। জনতা ট্রাকের সামনে শুয়ে পড়ে। অবরোধ। এখন ফৌজ ও পুলিশ যুগপৎ বিভ্রান্ত। ড্রাইভারকে পাওয়া যায় না। সুরজ দেখে ওরা লাশগুলি নামিয়ে নিচ্ছে। ওরা বলছে—আমরা ওদের নিয়ে যাব।

শেষ অবধি অফিসার ট্রাকের ওপর উঠে দাঁড়ায়। হাতজোড়

করে কি বলতে যায়। কিছুই সে বলতে পারে না। কেন না এখন শুধু স্কুলের ছাত্ররা আসতে থাকে। মৃতদেহগুলি ঘিরে ওরাও উত্তাল হয়। এখন গুলী চলে জনতার ওপর। আতঙ্ক, কোলাহল, ছুটোছুটি। সুরজ বোঝে যে ও নড়তেও পারবে না।

আহত ও মৃত। এবং রাজ চৌহানরা। ট্রাকের মিছিল চলে শামুকগতিতে। চারপাশ দিয়ে লোক দৌড়ায়। সদরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়। শহরের চেহারা হঠাৎ অচেনা লাগে। তারপর বোঝা যায় যে সাইকেল রিক্সা তুলে দেওয়া হয়েছে আজ। দেড় হাজার রিক্সা চালককে নিয়ে ওদের ইউনিয়ন নেতারা পুলিশ মর্গে হাজির হয়। সারোয়া চলে গেলেও রাজ চৌহান শহরের রিক্সা ইউনিয়নের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ছিল।

রাত বারোটা নাগাদ সারোয়ারাজপুর-উঠান ও কালিহারির লোকেরা পৌঁছে যায়। এখন এ জনতা বাইরে খুব শান্ত। ভোরবেলা ওরা লাশগুলি নিয়ে শোভাযাত্রা করে ফিরে যাবে। সুরজ বুঝতে পারে রাজ চৌহানকে মেরে সম্ভবত সূচনা হল। এখন "ফার্দার কুম্বিং অপারেশন" চলবে। ওর দিকে এবং ওদের দিকে তাকিয়ে মেয়েদের চোখে কি ঘৃণা, কি ধিক্কার। ওদের উর্দিকে ধিক্কার। হাতে বন্দুক, গায়ে উর্দি নিয়ে চেরোতে ঢুকলে মা, নান্দি, গ্রামের অন্য মেয়েরা, এমনি করেই কি ওকে ধিক্কার দেবে?

সুরজ ঠিক করে, আর নয়: এবার ও নির্ঘাত ফিরে যাবে ফৌজ ছেড়ে। এ কাজে ওর মন এভাবে বারবার ঘা খাচ্ছে। কিষাণ মেয়েদের চোখে এত ঘৃণা ছিল? অথচ সুরজ শিখেছে যে জওয়ানের উর্দি অত্যন্ত সম্মানিত। ভারতীয় জওয়ান ভারতের গৌরব।

সকালে ও নীরব দর্শক। কালকের ক্রোধবহ্নি নেই আজকের জনতার মুখেচোখে। ওরা বসে থাকে। রাজ ও মোতিচাঁদের দেহাতি বউ। গোবিনের বাবা লাশ নেয়। নিহত তিন গ্রামবাসীর ভাই, বাবা ও ছেলে নেয় তাদের দাদা, ছেলে ও বাবার মৃতদেহ। ছয়টি দেহ তোলা হয় ছই খুলে নেওয়া গরুর গাড়ীতে। ফুলে ফুলে পাহাড় জমে। ওরা চলে যেতে থাকে। রাজ ও মোতিচাঁদের বউরা

কাঁদে না। সুরজ বোঝে, ওরা শোককে ধারণ করছে, সঞ্চিত রাখছে। শোক থেকে ক্রোধ। ক্রোধ থেকে—?

ব্যস্ রাজ চৌহান কা কিস্‌তা খতম। কে যেন আস্তে বলে। আরেকজন বলে, এখন পাহাড়পুরে কিষুণপ্রসাদ, সারোয়াতে সেই তো ছিল রাজ চৌহান। আর নাথুনি করণের মেয়েকে বিয়ে করেছিল কিষুণ পাহাড়পুরেই। স---ব খতম!

একজন পাকানো চেহারায় প্রৌঢ় বলে, কৈসে খতম? এক কিস্‌কা খতম হয়, ঔর কিস্‌কা শুরু হয়। সারোয়া ব্লকে তো এই চলছে আজ কয়েক বছর। 'সমাচার' পত্রিকাতে সবই লিখেছে, দেখে থাকবেন।

—'সমাচার' তো গল্প লেখে সংবাদ লেখে না।

—কেন, রাজ চৌহানকে সমর্থন করে বলে?

—নিশ্চয়।

—বহোত তাজ্জব বাত।

সুরজ মনে মনে নিশ্বাস ফেলে। 'সমাচার' আপিসে গেলে সে হয়তো জানতে পারত অনেক কথা। কিন্তু তা সে করতে পারবে না।

সুরজ এর পরেই স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিল। আর তার আগেই সুরজের নিজস্ব কোলহানের আকাশে নৈর্ঋত কোণে ঝড়ের মেঘ ঘনিয়ে এল। চেরো বাঁধ প্রকল্পের চূড়ান্ত চেহারা। বিশ্বব্যাংক যখন টাকা দেবে, তখন একটা কোটি কোটি টাকার প্রকল্পই দরকার। সুবর্ণরেখা বহুমুখী প্রকল্পের রূপায়ণ হবে চারটি বাঁধপ্রকল্পকে কেন্দ্র করে। চেরো বাঁধ প্রকল্প তার মধ্যে প্রথম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাপ তৈরী হতে থাকে। কোলহানের আশি হাজার একর জমি জল পাবে, জলপ্লাবিত হবে, শতাধিক গ্রাম যাবে জলের নীচে। শত লক্ষ মানুষ হবে উচ্ছিন্ন।

কথা হয়।

—ওটা আদিবাসী জমি?

—অবশ্যই।

—উচ্ছেদ হবে আদিবাসীরা?

—অবশ্যই।

—ওরা জমির বদলে কি পাবে?

—টাকা।

—ওদের জানানো হবে কবে?

—হবে, হবে।

আদিবাসী উন্নয়ন অধিকর্তার মতামত কেউ জানতে চায় না। অত্যুৎসাহী কর্মঠ এবং নির্লোভ এই অফিসার বিহার প্রশাসনের শরীরে একটি দুষ্ট ব্রণবিশেষ এবং 'সবচেয়ে বেশি বদলি হওয়া' এক অফিসার। সে এখন জেনে গেছে যে এ চাকরির মেয়াদও তার ফুরাল বলে। তাই বেপরোয়া নির্ভীকতায় সে হাত তোলে।

সেচ অধিকর্তা বলেন, হাঁ হাঁ, বলুন বলুন শেঠনাজী। আপনি যা বলবেন, সে তো খুব দামী কথা হবে। আপনি ওইসব বুনো জংলী লোককে চেনেন জানেন। তবে কেমন করে ওদের ঘরে দাওয়াত খান, কে জানে।

—কেন?

শ্রীমতী পাঠক ছিটকে ওঠেন। সুদর্শনা, খানিক গোলালো, অত্যন্ত উদ্যমী এই মহিলা কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রকের এক বড় অফিসার। এঁর সম্পর্কে নানা রকম গল্প চালু আছে। শ্রীযুত পাঠক নামে যাঁকে দেখা যায়, তিনি নাকি আসল ভিমল পাঠক নন। আসল ও আদি ভিমল পাঠক নাকি কুলুতে আপেল বাগিচায় আপেল চাষ করেন।

শ্রীমতী পাঠক ডানদিকে আঁচল দিয়ে ঘুরিয়ে শাড়ি পরেন। তার কারণ নাকি তাঁর ডান বাহুতে একটি কালীমূর্তি উলকিতে উৎকীর্ণ আছে। এ খবরটির সত্যি-মিথ্যে জানা যায় না। তবে দেশের সেচ প্রকল্পে দিল্লির শ্রীপাঠকের ফার্ম বড় বড় কণ্ট্রাক্ট পায় এবং একটি সেচ প্রকল্প চালু হলেই শ্রীমতী পাঠক কলকাতায় এসে কালীঘাট, ঠনঠনে ও দক্ষিণেশ্বরে পুজো দেন, এটি বাস্তব ঘটনা। শ্রীমতী পাঠক শেঠনাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন ও 'আদর্শ অফিসার' বলে থাকেন।

তিনি সবেগে বলেন, আদিবাসীরা বুনো বা জংলী নয়। আর শেঠনা যদি চান, নিশ্চয় তাদের ঘরে দাওয়াত খাবেন। তা নিয়ে আপনি তামাশা করছেন?

—আববু! ওরা খায় মদ আর মাংস। শেঠনাজী তো চা অবধি খান না আর পুরো নিরামিষাশী।

শেঠনা ভুরু কুঁচকে থাকে। তারপর বলে—অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চার হাওয়া খুব জোর। আমার বিশ্বাস যে আদিবাসীরা জমিনের বদলে জমিন চাইবে।

শ্রীমতী পাঠক ঘুরে বসেন।

—তা ওরা পাবে না।

—চাইবে।

—কেন? টাকা তো পাবে।

—ওদের হাতে গিয়ে পৌঁছবে কি?

—তার মানে?

—কখনোই পৌঁছয় নি।

এ কথায় বেশ উঁচুস্বরে আপত্তির ঢেউ ওঠে। শেঠনা সম্ভবত আজ নিজের নিরাপত্তার নৌকার তলা নিজেই ফুটো করবে বলে মন ঠিক করে এসেছে। সে হাত তোলে এবং বলে, রাঁচিতে হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং, তিতপানি ম্যাঙ্গানীজ খাদান, কোটাবুরু সিলিকা প্রকল্প, প্রত্যেকবার যারা উচ্ছেদ হল, তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা তারা পায়নি সবাই, এবং নিশ্চয় সব টাকার একভাগ করেও পায়নি। এ কথা সবাই জানেন। যদি বলেন 'জানি না' তাহলে বলব আপনারা বাস্তবকে অস্বীকার করছেন।

শ্রীমতী পাঠক বলেন, এবার বিশ্বব্যাংকের টাকা আসছে। মোটা টাকা। হাতে হাতে পাবে।

শেঠনার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে হাসি বেদনায় বিষণ্ণ! সে বলে, তা জানি। চেরো বাঁধে যত জল তত টাকা আসবে। কিন্তু আমি জানি যে কোলহানের ওই অংশে চলে উইলকিনসনি ব্যবস্থা। সরকার ডাকঘর করতে হলেও মানকিমুণ্ডাদের জানায়।

—আদিবাসী সেন্টিমেণ্টের কথা ভাবতে গেলে এমন কাজে চলে না। এমন কাজটা ওদেরই স্বার্থে।

—মাপ করবেন। কাজটা যে হচ্ছে এবং হবে তা তো জানাই কথা। সে-কথা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য, এক্ষেত্রে ওদের সেন্টি-মেণ্টের কথা ভাবা উচিত এবং চেরো প্রকল্পে যেসব গ্রাম পড়ছে সেখানে জানানো উচিত।

—কেন?

—কেন না অলগখণ্ড মুক্তিমোর্চা কোনো অবাস্তব ব্যাপার নয়। সেটা সিংভূমের গরীবের অত্যন্ত বাস্তব ও দীর্ঘস্থায়ী অভিযোগের ওপর গড়ে উঠেছে।

—চেরোর দিকে সে হাওয়া নেই।

—আমার তা মনে হয় না। তাছাড়া একথা মনে রাখলে ভালো যে চেরো অঞ্চলের হো আদিবাসীরা লড়কা-হো। অবশ্য লড়কা-কোলও বলা হয়।

—ওরা লড়বে?

—আমি জানি না। তবে এটা জানি যে অন্য সমাজের প্রভাব ও ধাক্কা ওরা সবচেয়ে বেশী প্রতিরোধ করেছে।

—কেমন করে?

—ওরা হিন্দু, ক্রিশ্চান বা অন্য ধর্ম সবচেয়ে কম গ্রহণ করেছে। ওরা ব্রিটিশকেও দীর্ঘকাল ঢুকতে দেয়নি। আর চেরোর আশপাশে যারা আছে, তাদের তো কিছু কিছু ক্ষেতীও আছে।

—আপনি কি বলেন?

—আমার বিশ্বাস যে ওদের গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট আগে প্রকল্পের কথা জানানো দরকার। হঠাৎ জানলে ওরা বাধা দেবে।

—বাধা দিলে তা ভাঙা হবে।

—কেমন করে?

শ্রীমতী পাঠক বলেন, পুলিশ। ফৌজ।

শেঠনা আবার দুর্বোধ্য হাসে। এ তো ওরা জানেই। তাই করা হয় বলেই তো মুক্তিমোর্চার হাওয়া ছড়াচ্ছে। বেশ। পুলিশ ও ফৌজ

গেল। উন্নততর হাতিয়ার। কিন্তু তা কি অভিপ্রেত? তাই কি চাই আমরা?

—এ খুব গোলমেলে কথা।

—তারপর ওরা যদি জমিনের বদলে জমিন চায়?

—পাবে না।

সেচ অধিকর্তা বলেন, না, না, প্রচারের কথাটা খুব ভাল বলেছ শেঠনা। এটা করতে হবে।

লক্ষ লক্ষ টাকায় বোম্বের প্রেস থেকে সুবর্ণরেখা বহুমুখী প্রকল্পের লিটারেচার ছাপা হয়। বিতরিত হয় তা সর্বত্র এবং পড়ে থাকে তা ব্লকে ব্লকে।

পাটনায় এ ব্যাপারটি অসম্ভব পেট্রোল পোড়ায়। কেন না প্রত্যেকে ছুটতে থাকে দপ্তর থেকে দপ্তরে। ৪৮০.৯ কোটি টাকার প্রকল্প। এ কারবারে বাঘ সিংহ হয়ে যদি নাও ঢোকা যায়, আরশোলা হয়ে সেঁদোলেও লাভ। শিল্পপতিরা যে যার মতো উৎসাহী হয়। সিংভূমের মাটি শিল্পপতিদের কাছে সোনা। কি নেই সেখানে? খনিজ সম্পদের 'ক' থেকে 'হ' সবই আছে। বিহারের সর্বত্র ঠিকাদার ব্যবসায়ী সবাই নড়েচড়ে বসে। এসব নানা ধরনের, সমাজের নানা স্তরের লোক, সকলেই ভারতীয়। এদের কাজে এ প্রকল্প যদি লাগে তাহলে তা জাতির সেবাতেই লাগল। এসব কথাই রাজ্যের যিনি মাথা, তাঁর মাথায় থাকে। এখন তিনি সদুঃখে অনুভব করেন যে এই প্রকল্প যেহেতু একটি 'পাইয়ে দেবার প্রকল্প', সেহেতু চারশো আশি কোটি নব্বই লক্ষ টাকাটা শুনতে যেমন, আসলে তেমন বেশী টাকা নয়। অনেক লোক প্রার্থী।

এবং আজ যারা যুবক, সে সব টাউট, মস্তানরা সদুঃখে মাথা নাড়ে। এ প্রকল্প এখন আকাশচারী। যখন এটি মাটিতে নামবে, ততদিনে বেশ কয়েক বছর কেটে যাবে। ততদিনে তারা ফুটে যাবে প্রেক্ষাপট থেকে। আজ যেসব লৌণ্ডা বাচ্চা আছে, তারা তখন মাঠে ঢুকবে। বহোত আফশোস।

সেচ অধিকর্তা গভীর সন্তাপে পড়তে থাকেন। সেচ বিভাগের

হাত দিয়ে এত বড় কাজটা হবে, অথচ তিনি এ প্রকল্প থেকে কিছুই পাবেন না। চাকরিকাল তো তাঁর খতম হয়ে গেছে। তিনি আছেন এক্‌সটেনশনে।

শ্রীমতী পাঠক 'চুক চুক' শব্দে তাঁকে সমবেদনা জানিয়ে এরোপ্লেনের পেটে ঢুকে যান। সেচ অধিকর্তা তাঁর স্ত্রীকে বলেন, একটা প্রবাদ জান? দাই বলে, জন্মাক জন্মাক—অর্থাৎ জন্মালে সে কাজ পায়। বামুন বলে মরুক মরুক। তাহলে সে সৎক্রিয়া, শ্রাদ্ধ সব করাবে। নাপিত বলে, যা হতে চায় তাই হোক—কেন কি মানুষের জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু সব কাজেই নাপিত লাগে। আমাদের শ্রীমতী পাঠক হচ্ছেন নাপিত। যাই হোক না কেন, ওঁর নাফা থাকছেই। দিল্লীতে দুটো বাড়ি, সিমলায় বাড়ি, উত্তরপ্রদেশে কোথায় খামার আছে। কি ব্যাপার!

এমন সব ব্যাপারে কোলহানের লক্ষাধিক লোককে একথা জানাতে কারো মনে থাকে না যে তোমাদের ঘর-গ্রাম-ক্ষেত সব নিয়ে নেওয়া হবে। সিংভূমে সমৃদ্ধি আসছে।

আর শেঠনা ঠিক করে যে বদলির হুকুম তো এল বলে। সে একবার কোলহান ঘুরে আসবে। অনেক দিন যাওয়া হয়নি। অনেকদিন দাঁড়ানো হয়নি কোনো হো গ্রামবৃদ্ধের উঠোনে। পা ধোয়াবে মেয়েরা। জল এনে দেবে কেউ। তারপর বোস সাবুই ঘাসের দড়িতে বোনা খাটিয়াতে। ভুরা গুড় ও গোঁড় লেবুর সরবত খাও। তুমি তো ডিয়াং খাবে না। তারপর খবরাখবর বলো। আমাদের খবর ভালো নয়। যা খরা চলছে। গেরো ধানই শুকিয়ে গেল।

শেঠনা ওখানে গেলেই একমাত্র স্বস্তি পায়। ঘরে ফেরার অনুভূতি হয় তার। সে যে ঘরে থাকে সে সরকারি আবাসগৃহে তার শয্যা একটি লোহার নেয়ার খাট, দুটি বা তিনটি জামা, দুটি প্যাণ্ট, একটি গামছা ও একটি লুঙ্গি। সে খায় স্বপাকে। বইপত্র ছিটানো এ ঘরে, তার থাকা না থাকা যেন অস্থায়ী ক্ষণিকের অতিথির মত।

বাবা মাকে মনে পড়ে না। বয়সে অনেক বড় দাদা ও দিদির সঙ্গে সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। বিয়ে করা তো হয়ে ওঠেনি এবং যে সহপাঠিনীকে সে ভালবেসেছিল বলে মনে করত, তার কথাও মনে হয় না কখনো। বিহার তার কর্মক্ষেত্র। বিহারে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব কখনো আসে না। কেন না আই এ এস অফিসারের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব আনতে পারে একমাত্র সমমর্যাদার লোকজন। সে সব লোকজনকে শেঠনা দশ হাত তফাতে রেখে চলে। সে-সব লোকও শেঠনাকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখে। যে লোক ইচ্ছে করলে মাসে লাখ টাকা ঘুষ নিতে পারে অথচ নেয় না এবং কি ভয়ানক কথা! যখন যে পদে থাকে, কায়েমী স্বার্থে চোট মেরে ছাড়ে, ঘুষদাতাকে ধরিয়ে দেয়, তেমন লোককে বিহারে কেউ বিশ্বাস করে না।

শেঠনা এসব নিয়ে কখনোই ভাবে না। আজ তার মনে কেন যেন অস্থিরতা আসে, উদ্বেগ। একবার যাবে সে কোলহানে। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে যাবে। একমাত্র গরীবরাই বোঝে যে শেঠনা ওদের বড় আপনজন। শেঠনা ওদের ভালাই করতে চেষ্টা করলেই বদলি হয়ে যায়। ফলে কাজটি সবসময়ে হয় না। তবু ও আপনজন।

জেলার খবরের কাগজ, চিঠিপত্র "সমাচার" কাগজের পাতা খুলতেই রাজ চৌহানের মৃত্যুর খবর চোখে পড়ে। তিন সপ্তাহের "সমাচার" একসঙ্গে এসেছে। আরেকটি খোলে শেঠনা। "বলরামপুর কলিয়ারি দুর্ঘটনায় মৃত কতজন? ঠিকাদাররা বালক শ্রমিক খাদানে নামাল কেন? এর কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে কি?"

শেঠনা সে লোক নয় যে এমন সব ঘটনা দেখতে দেখতে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বিচলিত না-হবার অভ্যাস রপ্ত করেছে। সারাটা কর্মজীবনে, ষোল বছর ধরে সে এই রকম সব ঘটনাই দেখছে। তবু সে বিচলিত হয়। বার বার সে বলে, কি নৃশংস! কি ভয়ানক! বালক শ্রমিক! তারা অন্য রাজ্যের আদিবাসী। আর রাজ চৌহান! রাজ চৌহানের হত্যার পর থেকে সারোয়া বিক্ষুব্ধ, বিক্ষুব্ধ! শ্রীমতী পাঠকরা তো "সমাচার" পড়েন না।

পুলিশ নামিয়ে গরীবের প্রবক্তার মোকাবিলা করলে সমতল কৃষি-ভূমি সারোয়া বিক্ষুব্ধ হয়, তেমনি বিক্ষুব্ধই হয় পাহাড় ও জঙ্গলভূমি কোলহান।

এখন সে চেয়ে। অঞ্চলের গ্রামগুলির কথা ভাবতে চেষ্টা করে। আর হঠাৎ মনে পড়ে কালু সুমরাইয়ের কথা। "কোলহান রক্ষাদল" করতে গিয়ে সে ভীষণ মার খেয়েছিল। কালু সুমরাই তো ওই অঞ্চলে বসে আছে। কালুর ঘরে তার বাহা পরবে নেমন্তন্ন ছিল, মাটা গাগরাইয়ের ঘরে ছিল মাঘে পরবের নেমন্তন্ন। ওরা এসেছিল রামপুরে একটা আদিবাসী স্কুলের কথা বলতে। সেটা কাঁদিয়ে দেওয়া গিয়েছিল।

॥ চার ॥

শেঠনার মনটা ভাল হয়ে যায়। ওখানেই যাবে সে। অত্যন্ত ক্লান্ত সে, অত্যন্ত। পাটনা শহর তাকে ক্লান্ত করে ফেলে। এত ভিড়, এত অশ্লীলতা, এত চীৎকার তার জগতে। শেঠনা ছুটি নেবে, যাবে বানো গ্রামে।

যাবার আগে জেনে নেবে, "কোলহান রক্ষাদল" বিষয়ে হঠাৎ এমন কড়াকড়ি কেন হচ্ছে।

কালু সুমরাই বলে, কেন হবে না বল শেঠনাজী? বরুণ জোংকো আর ভারত মিন্‌জ, দুজনে বহোত ঝামেলা করছে। বলে, তোমার কোলহান রক্ষাদল আছে তা তো জানি না। আমরা নতুন কোলহান রক্ষাদল গড়েছি।

—ওরা কি করে?

—দুজনেই শিক্ষিত। বরুণ তো গ্র্যাজুয়েট আর ভারত টাটায় ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে অফিসার।

—বাঃ, ভাল তো?

—দুজনেই কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

—রক্ষাদল করছে?

—ওরা স্বাধীন কোলহানিস্তান করবে।

—কি রকম?

—আঠারো শো সাঁইত্রিশে উইলকিনসন যে পহেলা সেটলমেণ্ট করেছিল তার ভিত্তিতে।

—বুঝলাম।

—গ্রামের মুখিয়া থাকবে মুণ্ডা, আর কয়েকটা গ্রামের মাথা হবে মানকি, আর মানকি-মুণ্ডা শাসনই চলবে, এই তো কথা।

—ওরা কি বলছে?

—সব তো জানি না। তবে বহোত ক্ষেপে গেছে আর বরুণ চাকরি পেল তো কাজে গেলই না। ওরা কাগজ ছাপাচ্ছে, স্বাধীন কোলহানিস্তান করবে। তাতে এতকাল বাদে আমার পিছনে পুলিশ লেগে গেল।

—কেমন আছ বল?

—আমি তো মনে করি খুব ভাল আছি। খুব আফশোস যে, মাটার সঙ্গে তোমার দেখা হল না। চলো, কাল চেরো যাই।

—সেখানে কে আছে?

—সুরজ গাগরাই। মাটার নাতি।

—সে কি করে?

—খুব তেজী ছেলে। ফৌজে ছিল, ছেড়ে দিয়ে চলে এলো। তুমি কি জানো যে বলরামপুরে খাদানে ধস নেমেছিল? ও সেখানে ছিল। তারপর কোন্ রাজ চৌহানকে মেরে দিল পুলিশ না সিপাহী······

—সেখানেও ছিল?

—সেখানেও।

শেঠনা খুব চমকিত হয়। সুরজ গাগরাই সেখানে ছিল, সুরজ ফৌজ ছেড়ে দিয়েছে। কেন? দুয়ের মধ্যে যোগ কোথায়? যোগ আছে কোন?

কালুর বৌ পেট আঁচলে কয়েকটা ঢেঁড়স আর বেগুন নিয়ে আসে কোথা থেকে। রুক্ষ চুলে ঝুঁটি, একটি দাঁত নেই, মধুর হেসে হাত চিতিয়ে বলে, কুপুল, অতিথি এল ঘরে। তো মাংস চাই না, ডিয়াং চাই না, খাও সব্জি আর ভাত। ডিয়াং অব্যু রুখিয়ার বাপও খায় না।

—সে কি? কবে ছাড়ল?

—যবে থেকে নেতা বন্‌ল। তারপর বলো! এখনো তেমনি ফকির হয়ে আছ? এত বড় হাকিম তুমি! তোমার একটা বউ জোটে না কেন?

—সেই তো কথা।

—স্নান করে এস এখন তো বৃষ্টি পড়ে গেছে। চেয়োতে বেশ জল পাবে।

—তেল দাও।

তেল মেখে চেয়োর ঘোলা জলে স্নান করতে করতে শেঠনা বলে, চলো—কাল ইলাকা কাঁপানো যাক।

—এখনো অফিসার আছ?

—আরে! তা তো আছিই।

—বদলি করেনি?

—করবে। এখনো আছি।

—চলো। গোলমাল অনেক।

—সে তো থাকেই।

—হ্যাঁ, এর নাম কোল্হান।

চেয়োর জল দেখলে ঘোলা মনে হয়। কিন্তু জলে নামলে বোঝা যায় যে, জল খুব স্বচ্ছ। ওটা বালির বাদামি রং। স্নান করতে করতে শেঠনা বলে, ঘরে গিয়ে তুমি আমাকে এ অঞ্চলের গ্রামগুলোর নাম বলবে। ধরো এদিক-ওদিক একশো মাইল জুড়ে।

—সব লেখা আছে।

—লেখা আছে?

—স-ব। মৌজা-তহশীল থানা, সব। কেন থাকবে না তাই বলো শেঠনাজী। বসে বসে কি আর করব, এ সবই করি ··· কালুর গলাটা ক্ষীণ হয়। ভেসে যায়, কালু শেঠনার দিকে চেয়ে থাকে। তার দুই চোখ খুবই জিজ্ঞাসু ও হিসাবী। গ্রামগুলির নাম তালিকা-ভুক্ত করা আছে। এ ব্যাপারটা শেঠনা কিভাবে নেবে? হাজার হলেও শেঠনা সরকারি অফিসার আর কোলহানের জন্য যত দুঃখ থাকুক, সে আদিবাসী নয়।

আজ চেয়োর জলপ্রবাহে, বানো গ্রামের আকাশের টুকরো টুকরো ভীষণ ব্যস্তবাগীশ মেঘে, জলে ঝাঁপাঝাঁপি নিরত শিশুদের উল্লাসে কি যেন থাকে—শেঠনা সব বুঝতে পারে। শেঠনা আদি-

বাসী নয়, কিন্তু চামড়ার রং যাই হোক, সে আধা আদিবাসী হয়ে গেছে।

তার কারণ দুটো। এক, আদিবাসী, হরিজন, বলতে কি যেসব মানুষ বিহারে অবিচারের শিকার—তাদের জন্য তার তীব্র দরদ, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। দুই, আদিবাসীরা সর্বদা প্রশাসনের ও বাইরের সমাজের ধান্দাবাজ লোকদের নানারকম ষড়যন্ত্রের শিকার। আজ সিংভূমে যদি পাঁচজন আদিবাসী "কেরোসিন চাই" বলে চেঁচায়, তখনি সাব্যস্ত হয় যে, তারা "অলগখণ্ডী" এবং তাদের নাম চিহ্নিত হয়ে যায়।

শেঠনা, তার ওপরওয়ালা ও রাজ্যের বড় বড় মাথাদের কাছে সর্বদাই সন্দেহের পাত্র। অত্যাচারিত ও নিপীড়িতের জন্যে তার আন্তরিক দরদ, অবিচারের নিরসন করার জন্যে তার ভীষণ ছুটোছুটি, এগুলোকে খুবই সন্দেহ করা হয়। ফলে সে মনে মনে খুবই একলা এবং এ রকম অবস্থায় থাকতে থাকতে সে সেই সব লোকের অনুরূপ হয়ে যাচ্ছে। যারা নিরন্তর তাড়িত, যাদের সব সময়ে সন্দেহের চোখে দেখা হয়, যারা অবিচারের কথা বললে কোন বিচার পায় না।

অবশ্যই সামাজিক অবস্থিতিতে শেঠনা কালু সুমরাইদের আপনজন নয়, মানসিক অবস্থিতিতে তারা স্বগোত্র।

শেঠনা কালুর চোখে চোখ রাখে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, সে তালিকা তৈরী করেছ বরুণ ও ভারতের জন্যে?

কালু মাথা হেলায়।

—ছাপিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—সেগুলো কোথায়?

—ওরা নিয়ে গেছে, আছে···

—পুলিশ সেগুলো পায়নি?

—না। কেমন করে পাবে? রুখিয়ার মা সেগুলো রেখেছে তুষের ডোলের মধ্যে।

—কালু! কালু সুমরাই! বুড়া খচ্চর!

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। কালু মুমরাইয়ের মুখ দোষ করে ধরা পড়া ছোট ছেলের মতো। কালু ভাবে, কেমন করে বা বরুণ ও ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের কথা অস্বীকার করতাম? সে বলে, শেঠনাজী! ওরা আমার দেয়া নামটা নিয়েছে আর তালিকাটা আমি তৈরী করছিলাম, তা সুরজ বলল ছাপিয়ে দাও। তালিকাও নিয়েছে। কোলহানিস্তানের দাবীর ওপর তো আমাদেরও সমর্থন আছে। কিন্তু ওরা যা করছে, তা তো বুঝি না।

—কি করছে?

—শেঠনাজী! পেটে আঙ্গুল চালিয়ে তুমি সব কথা বের করে নিচ্ছ। ওরা স্বাধীন কোলহানিস্তান ঘোষণা করেছে আর এর জন্যে দরবার করতে ওরা বিদেশেও যাবে।

—তুমি এসব তালে আছ?

—কেমন করে থাকব? এত বড় কথা তো আমি বুঝতেই পারছি না।

—ভালো। তা সব চেপে যাচ্ছিলে কেন?

—বলতাম।

—চলো, জল থেকে উঠি।

কালুর বউ ওকে গ্রামতালিকা বের করে দেয়। বলে, রুখিয়ার বাপ তো ভেবেই সারা। আমি রেখে দিলাম তুষের ডোলে।

রুখিয়া বা রুকমনিয়া ওদের মেয়ে। তিন মাস বয়সেই সে মরে গেছে। এখন সে বেঁচে আছে বাপ ও মায়ের পরিচিতি যে নামে, সেই নামের মধ্যে।

ভাত, ঢেঁড়স ও বেগুনের ভাজি, লবণ ও লংকা। খেয়েদেয়ে শেঠনা বোঝে, বহুকাল পরে গা ঢেলে ঘুম আসছে। সে চারপাইটি গাছের নিচে নেয় ও নিম গাছের মমতাময় ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙে তার হ্যাঁচকা টানে। কে যেন তাকে চারপাই শুদ্ধ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। দাওয়ায় চারপাই নামাবার পর শেঠনা উঠে বসে। বিশাল লম্বা চওড়া এক যুবক। গোঁফটি তেজালো, চুল

ছোট করে ছাঁটা। পরনে খাঁকি শার্ট ও ধুতি, সে হাতজোড় করে বলে, আমি সুরজ গাগরাই। আপনি ভিজে যেতেন।

এক ফোঁটা, দু ফোঁটা, তারপর ঝম্‌ঝমিয়ে জল নামে। কালুর বউ দৌড়য় বোরাগুলো ঘরে ওঠাতে। কালু দৌড়য় সুবজ দৌড়য় শুকনো কাঠ ওঠাতে। কিছুক্ষণ যায় এসব কাজে। তারপর সবাই এসে বসে। সুরজ বলে, তেজী বুন্দ বর্ষাচ্ছে। এমন বর্ষা কয়েক বছর হয় না।

কালুর বউ বলে, শেঠনাজী এমন জলটা আনল।

সুরজ এবার শেঠনার সামনে বসে। কালু বলে, সুরজ আমাদের বীর কোল্‌হা। ও এসেছে তো বুকে অনেক জোর পেয়েছি।

শেঠনা বিনা ভূমিকায় বলে, তুমি বলরামপুর আর সারোয়াতে ছিলে?

—হ্যাঁ শেঠনাজী।

—কি দেখেছ?

—তখন তো আমি ডিউটিতে ছিলাম। আর তখন ফৌজেই ছিলাম। কি দেখেছি, তা কি বলতে পারি?

কালু বলে, সুরজ! শেঠনাজীকে বলা যায়।

—কেমন করে? শেঠনাজী আমাকে ফাঁসালে, তারপর আমার মান থাকবে কোথায়?

—একথা কেন বলছ?

—জী! এ-নিয়ে কোন তদন্ত হবে?

—সম্ভাবনা খুব কম। ওরা রেগুলার লেবারও নয়, ঠিকাদারের লেবার এবং অন্য রাজ্যের।

—তাহলে বলে কি লাভ?

—জানতে চাই। আমাকে তো আদিবাসী গরীবজন সব কথাই বলে আর তাতে কারো ক্ষতি হয়নি।

—বেশ।

সুরজ নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনার ইমানদারির ওপর বিশ্বাস রেখে সব বলছি। বলরামপুরে আমি একা যত লাশ তুলেছি, তা

সরকারি হিসাবের অনেক বেশী। আমি একা ছিলাম না। অন্যরাও উঠায়। তবে আমি বেশী উঠাই। আমার দেহে তাগত খুব বেশী।

—হ্যাঁ, এই তো আমাকে তুলে আনলে।

—আপনি জিন্দা মানুষ, রোগা-পাতলা। মরা মানুষ ভারি হয় আর টেনে উঠাতে তাগদ দরকার হয়। স—ব ছোট ছোট ছেলে। ওরা ও ইলাকায় বলরামপুর খাদানকে "খুনী খাদান" বলে। ওটার হালও খুব খারাপ ছিল। কোনো রেগুলার লেবার নামতে রাজী ছিল না। এর কোনো তদন্ত হল না, কেউ একটা কথা বলল না।

—"সমাচার"কে খবর তুমি দিয়েছিলে?

—বেনাম চিঠি দিয়েছিলাম। আমার এক দোস্ত চিঠিটা লিখে দেয়। আমার হাতে লেখা নয়।

—তদন্ত হলেও তো কোন সুফল হয় না। আর বলরামপুরে ঠিকাদার কোথা থেকে লেবার এনেছিল, এখন বের করা কঠিন। খুবই কঠিন।

—কিছু হবে না।

সুরজ কথাটি প্রশ্ন হিসেবে বলে না। এমনি একটি বক্তব্য হিসেবে বলে। শেঠনা ক্ষুব্ধ হাসে।

—যা হতে পারে তা আমি আগেও বলেছি তোমার ঠাকুর্দাকে, কালুকে। সেই কথাই বলি। যাদের ছেলে গেল তারা লোকজন জুটিয়ে যদি ঠিকাদারকে ঘেরাও করে খুব পেটায় আর প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয়, এই একমাত্র রাস্তা।

—এখানে তা হবে না। ওরা অন্য রাজ্যের লেবার। আর এ সব ঠিকাদারের লেবার কোন ইউনিয়নে নেই, থাকে না। এদের মা-বাবা কে সঙ্গে আছে, কে অন্যত্র, তা বলতে পারব না।

—এহি আফশোস। এ যদি সাঁওতাল ইলাকায় হত, তাহলে ভাবতে হত না। সাঁওতালরা বড় জঙ্গী জাত। তারা স্বজাতীর উপর অত্যাচার হয়েছে জানলেই গিরা পাঠায় আর একজোটে অত্যাচারীকে আক্রমণ করে। ওদেরকে সবাই ভয় করে।

—এই তো বলরামপুরের কথা। আর সারোয়াতে আমি খুব

তাজ্জব বনে যাই। আমরা তো শুনেছিলাম যে ডাকাতের মুকাবিলা করতে যাচ্ছি। কিন্তু রাজ চৌহানের লাশ দেখবার জন্যে, নেবার জন্যে সেদিন গরীব কিষাণ মেয়ে মরদ, বুড়ো-বাচ্চা হাজারে হাজারে আসে আর তাদের হঠাতে গুলিও চলে। পরে জানলাম, সে কোনো ডাকাত নয়, দাগাবাজ লোক নয়। সে যে কি, তা সারোয়ার লোকরা ব্যানারে লিখেছিল, রাজ চৌহান অত্যাচারীর দুশমন, গরীবের বন্ধু।

—তুমি ফৌজ ছাড়লে কেন?

—মনে দুঃখ এসে গেল। সারোয়াতে জঙ্গল নেই, পাহাড় নেই কিন্তু ওখানকার কিষাণরা কোলহানের লোকদের মতই ছিল আর ওরা আমাদের কোন কথার উত্তর দিচ্ছিল না। ওরা আমাদের ফৌজী উর্দিকে ঘৃণা করছিল। আমার মনে দুঃখ এসে গেল।

—তুমিও কি রক্ষা দল করছ?

—কালু বলল, ও অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চার সভায় যাচ্ছে আজকাল। আমি অবশ্য বাইরে থেকে শুনছি।

সুরজ বলল, এসব কথার তো কোন মানে নেই। আমি বুঝি সিধা হিসাব। সিংভূমের মানুষ জঙ্গী ছিল আর জঙ্গী আছেও। কিন্তু তারা সিধা-সাদা, জঙ্গল পাহাড়ের মানুষ। তারা বোঝে না সভ্য মানুষদের কৌশল। তাই তো সিংভূমের যত খনিজ তাতে তারা কারখানা ফাঁদল। আর স্বাধীনতার পর এত বছর হয়ে গেল, এখনো আমরা যে আঁধারে ছিলাম তার চেয়েও গভীর আঁধারে ডুবছি তো ডুবছি। এর শেষ কোথায়?

কালুর বউ ঠক্ করে চায়ের গেলাস নামায় দুটো। নিজে বসে চায়ের লোটা নিয়ে। তারপর বলে, মানুষের হাল এখন খারাপই হবে।

সুরজ বলে, এই জন্যেই আমার বাবারা কোলহান ক্রান্তি দল করেছিল। আমাদের সময়ে দেখছি কোলহান রক্ষা দল। আর অলগখণ্ড তো সে জন্যেই। নানা দিকে নানা দল ভাবছে আর বুঝছে যে, হাত পাতলে সরকার কিছু দেবে না। যেটা হকিয়ত্তি পাওনা, সেটা লড়াই করে আদায় করে নিতে হবে।

—তুমি কি ভাবছ ?

—কোলহান রক্ষা দল যা করছে করুক। আমি কাজ করব। আমার ইলাকায়।

—কি ব্যাপারে ?

—শেঠনাজী ! ব্যাপারের তো কোন ঘাটতি হয় না। জঙ্গল নিয়ে আছেই লেগে ঝামেলা। নয় আর কিছু আছে। এই তো সিমঝেরা জঙ্গল আদিবাসীদের জঙ্গল। সেখানে দিকু লোক ঢুকতে গেলে ঝামেলা হবেই। ওহি প্রসঙ্গে কালু দাদা নেতাও বনল, ওর মারও খেল। এখন জঙ্গলের গার্ডরা নতুন বাহানা তুলেছে। শিয়াল পাতা জানেন ? যে পাতা থেকে মাহালিরা মাথায় দেবার চুটুর বানায় ! আমাদের তো ছাতা নেই। চুটুর আমাদের রোদেজলে সম্বল।

—জানি। আমার একটা ছিল। ভাল মনে করেছ। এবার একটা দিও। ওটাতে আর চলে না।

—মাহালিরা বন থেকে পাতা তুলে আনছে আর জঙ্গলচৌকিতে জঙ্গল গার্ডরা ধরছে।

—কেন ?

—জঙ্গলের সব কিছু নাকি জঙ্গল উন্নয়ন পর্ষদের সম্পত্তি। জঙ্গল জাতীয় সম্পত্তি।

—তারপর ?

—ওটা আছে, আরো ব্যাপার আছে। কেন্দু গাছ-পাতা জাতীয় সম্পত্তি তো একটা খুটকাট্টি জঙ্গল, বিড়িপাতা জঙ্গল। সেটা লোচন পূর্তির কাছ থেকে বেনাম-ইজারা নেবার জন্যে রাওল লোক লাগায়। লোচনকে বললাম, কক্ষণো নয়। তোমার জঙ্গল আছে তো আদি-বাসী লোক কতজন বেঁচে যাচ্ছে। তা লোচন রাজী হয়নি। তাতে তার উপর নতুন হামলা এসেছে। হাটে তার যে দোকান আছে, সেখানে নাকি চোরাই মদ চালান হয়। পুলিশ এসে দোকান বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা এবার দোকান খুলব আর এ-নিয়ে ঝামেলাও হবে।

—হ্যাঁ, উপলক্ষের শেষ নেই, হয় না।

—মানুষ খুব বোঝে।

—তা বোঝে।

—কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেয় কে?

—সেই তো কথা।

—এগুলো ছোট লড়াই। বড় লড়াইও আসছে একটা। ছোট ছোট লড়াই না করলে তখন পারব কেন?

—কি সে বড় লড়াই?

—সুবর্ণরেখা বহুমুখী প্রকল্প। চেরো বাঁধ প্রকল্প। এখন মনে হচ্ছে সেটা আসছে।

শেঠনা স্তম্ভিত হয়ে যায়। সুরজ হাসে। বলে, আপনিও জানেন।

—শুনেছি।

—এই জন্যে গ্রামের নাম চাইছিলেন?

—সবই ভাসাভাসা। আমি কিছুই জানি না। তবে গ্রামের তালিকা থাকলে···

—জানাতে পারবেন কোন্ কোন্ গ্রাম যাবে।

শেঠনা মাথা হেলায়। তারপর বলে, এখনো সবই ভাসাভাসা কথা চলছে।

সরল বিশ্বাস ও প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞতার একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ সুরজের মধ্যে ঘটেছে। সে বলে, পাটনায় বসে তো চেরো বাঁধ প্রকল্প চালু করা যাবে না। এটা কোলহানের কথা। আমাদের মানকিমুণ্ডাকে জানাতেই হবে। জানালেই আমরা বুঝে দেখব।

কালু গভীর ক্ষোভে বলে, টাকা দেখাবে।

—জমিনের বদলে জমিন। নয় তো কোলহান থেকে হাত উঠাও। কে চায় তোমার বাঁধ-প্রকল্প। কে চায় তোমার জল? কে চায় শিল্প-কারখানা, নতুন নতুন শহর? অনেক শিল্প দেখেছে কোলহানের মানুষ, অনেক কারখানা অনেক শহর দেখেছে। ভারতের সকল রাজ্যের বড়লোককে আরো বড়লোক করার দায়

একা কোলহানের নয়। সিংভূমের বুক থেকে কোটি কোটি টাকা নাফা উঠাবে রাজ্য সরকার আর সিংভূমের লোক খাবে গুলি, এমন আর চলতে পারে না।

শেঠনা শুধু বলতে পারল, সুরজ! তুমি সাবধানে থেকো। খুব সাবধানে থেকো।

—আমার গায়ে কে হাত দেবে?

সুরজের এ উক্তি দম্ভের নয়, বিশ্বাসের। শেঠনা বলল, তোমার উপর বহুজনের ভরসা।

রামপুরের হাটে লোচন পুর্তির দোকান সুরজরা খুলেছিল। এটা ওদের জয়। রাওল এ ব্যাপারকে বেশি ঘাঁটায় নি। কোলহানে এখন অলগখণ্ডের হাওয়া, কে চায় ওদের ঘাঁটাতে?

আর সিমঝেরার অদূরে জঙ্গল চৌকিতে সেদিন অসম্ভব ঘাবড়ে যায় জঙ্গলরক্ষীরা। কেন না তারা শেঠনার সামনে পড়ে। 'আমি শেঠনা। যাও তোমার বাবুদের ডেকে আনো' বলে শেঠনা গ্যাট হয়ে বসে জঙ্গলচৌকির সামনে।

জঙ্গল-অরণ্য-বন, যে নামে ডাকি না কেন, শব্দগুলি বহুমাত্রিক। কবি ও প্রকৃতিপ্রেমীর কাছে বন রহস্যময়। কখনো ভয়াল, কখনো মনোহর। ফুর্তিশিকারীর কাছে বন কখনো পিকনিকের, কখনো ঝোপেঝাপে আদিবাসী মেয়েদের স্বাস্থ্যের ও শরীরের খোঁজখবর নেবার জায়গা।

গরীব অঞ্চলবাসিন্দাদের কাছে বন চিরন্তন জননী। সে কাঠ-পাতা-ফল-কন্দমূল দিয়ে বাঁচায়।

রাজ্য সরকারের কাছে সিংভূমের বন ও বনজসম্পদ রাজস্ব। বন উন্নয়ন পর্ষদ ও ঠিকাদারের কাছে বন বহুমুখী মুনাফার উৎস।

শেষের ব্যাপারগুলিই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানেই বন আছে, সেখানেই বনবিভাগের প্রতাপ অত্যাচার ও বদমায়েশি অন্তহীন।

সিমঝেরার বিটঅফিসার ও রেঞ্জার ভয়ানক ঘাবড়ে চলে আসে। শেঠনা তৎক্ষণাৎ তাদের নামধাম লিখে নেয় এবং এক কৌতূহলী জনতার সামনে বলে, কিতা পাতা, শিয়ালপাতা, এ সব কিছুই

জাতীয়করণ হয় নি। এরা পারমিট নিয়ে পাতা তোলে, কোন্ অধিকারে এদের হয়রানি করেছ?

—সার। এরা কি বলছে ····

—একদম চুপ! এরা মাসে পাঁচসিকা দেবে এবং পাতা উঠাবে। তোমাদের আমি ভাল করে জানি। নাফা লুটবে বলে এখানে এসে বসেছ। সরকারকে ঠকাচ্ছ, ঠিকাদারের কাছে ঘুষ খাচ্ছ, আবার রুটি মারছ?

—হু-বেলা বেআইনী গাছ কাটছে জী!

—আবার কথায় কথায় পাঁঠা মুরগি চায়।

সুরজ বলে, এবার খাবে। ভাল করে খাবে।

বারবার ক্ষমা চেয়ে দুজনেই পালিয়ে বাঁচে। রেঞ্জারের আসার কথা নয়, সে এসে পড়েছিল। শেঠনার কথা দুজনেই জানে। হাজার হলেও সিংভূমের শেঠনা একটা কিংবদন্তী।

শেঠনা ওদের চলে যাওয়া দেখে। তারপর নিজেও হাঁটতে থাকে। মোহন তিরকে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে বানো গ্রামে।

ওর পথ যেখানে বেঁকে যায়, সুরজ সেখান থেকেই বিদায় নেয়। বলে, চেরোতে আসবেন একবার। মকাইয়ের ছাতু খাওয়াব। আপনার কখনো দরকার পড়লে আসবেন। কোলহানের মধ্যে চেতনা যেমন জাগছে, তেমন এ সব পরবপূজার জমকও ভারি হচ্ছে।

—তুমি ভাল থেকো।

·খুব ভাল আছি, আর থাকব··।

হাসি মুখে এক হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে সুরজ। সেই চেহারা-টাই মনে থাকে শেঠনার। আদিগন্ত আকাশ মেঘের ভ্রূকুটিতে কুটিল। আকাশের পটভূমিতে সুরজ। বলিষ্ঠ, আত্মস্থ এক বীর কোল্‌হা। মেঘের ওই কুটিল ভ্রূকুটি যেন সুরজকে ঘিরে ঘনিয়ে আসা কোনো ষড়যন্ত্রের জাল। সুরজকে দেখে বলে দিতে হয় না। যে সব লড়কা-হো একদিন দুরন্ত স্বাধীন ছিল, ও তাদেরই উত্তর-পুরুষ।

ভাল থেকো, বেঁচে থেকো, অক্ষত থেকো সুরজ, শেঠনা মনে মনে বলে।

আর সুরজ জোরে জোরে পা চালায়। জঙ্গলের সম্পদে কোলহানের মানুষগুলির অধিকারের দাবীতে আজ জনসভা আছে। চলতে চলতে সুরজ ওর সঙ্গীকে বলে, আন্দোলন করব! লড়াই করব বললেই হয় না। মানুষকে সর্বদা উশকাতে হয়, দেখ! তোমার উপর অবিচার হল, দেখ! তোমার অধিকার কেড়ে নিল।

ওর সঙ্গী এক তরুণ যুবক, চাঁদো পুর্তি কলেজ ছেড়ে ও অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চায় ভিড়ে গেছে। কালুর ভরসা সুরজ গাগরাই আর সুরজের ভরসা চাঁদো। চাঁদো লেখাপড়া জানে, কথা কম বলে, অলগখণ্ড সংগ্রাম নিয়ে ওর অনেক নিজস্ব ভাবনাচিন্তা আছে।

সুরজের কথার উত্তরে ও বলে, দেখ! চেরো বাঁধ প্রকল্প যদি হয়, তাহলে সেটা নিয়ে আলাদা সংগ্রাম করতে হবে।

—অলগখণ্ড থেকে আলাদা?

—অলগখণ্ড থেকে তো কিছুই আলাদা হতে পারে না। সবই তার অংশ।

—তাই বলো।

—বরুণ আর ভারতের কোলহান রক্ষা দল দিয়ে কাজ হবে বলে মনে হয় না।

—আমাদের কাজ আমরা করে যাব।

॥ পাঁচ ॥

খুব তাড়াতাড়ি চেরো বাঁধ প্রকল্প হয়ে ওঠে এক বাস্তবতা। কেন না এক কংগ্রেস-ই মায়লে জানিয়ে দেয় গ্রামগুলির নাম। জেলার খবরের কাগজে ধ্যাবড়া কালিমাখা হরফে ফেটে পড়ে দুঃসংবাদ।

হর ক্ষেত কো পানি, হর হাঁথ কো কাম।

দশ বছর ধরে কাজ চলবে। আগামী সাত-আট বছর ধরে প্রায় বিশ হাজার আদিবাসী স্থায়ী ও অস্থায়ী কাজ পাবে।

রাজনগর, পোটকা, গামহারিয়া, চাইবাসা, সেরাইকেলা ও খুঁট-পানি অঞ্চলে দুই লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শো একর কৃষিক্ষেত্র জল পাবে।

একুশ হাজার একর আদিবাসী জমি জলমগ্ন হবে।

হর ক্ষেত কো পানি, হর হাঁথ কো কাম।

কুড়িটি গ্রাম যাবে জলের নিচে, একচল্লিশটি গ্রাম হবে আধো-ডোবা। সব আদিবাসী গ্রাম।

চেরো প্রকল্পের জন্যে জমি দরকার হবে এবং একষট্টিটি গ্রাম ধ্বংস হবে, এ কথা কোলহানে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী গ্রাম হতে গ্রামে ছড়ায় আতংক বিক্ষোভ। সে খবর পাটনাতে যখন পৌঁছয়, লিখিত শব্দগুলি পাটনার মাথায় যথাযোগ্য গুরুত্বে আঘাত করে না।

—সব চেয়ে বোকা ওই মায়লেটা।

—কি দরকার ছিল রাজ্যসভায় এ কথা তুলবার?

—আদিবাসীদের জানানো হয়েছিল?

—কে জানে সে কথা!

—ওরা আবার একটা গোল পাকাবার বিষয় পেয়ে গেল। এখন দেখ কত ঝামেলা করে।

—কত ঝামেলা করবে!

—জংলী বুনো জাত!

"জংলী বুনো জাত" বলে যাদের ডিসমিস করে দেয়া হয়, তাদের কথা ভুলতে পারে না একা শেঠনা। চেরো, বানো, বিরজিলুহাতু, বিন্দিহাতু, বিচাবুরু, সিমঝেরা, কোন গ্রাম নেই। আছে এক বিশাল জলবিস্তার, ভাবতে গেলেও তার কেমন যেন লাগে। কোল-হানের সন্তানদের ও খুব ভাল করে জানে ও চেনে।

ওর মনে হয় কোনো একটা কিছু ঘটতে চলেছে, যা না ঘটলেই ভাল হত। কিন্তু বর্তমানে সে ক্ষুদ্রশিল্প নিগম সচিব। ফলে তার করারও থাকে না কিছু। বসে বসে সে ভাবে এবং দীর্ণ হয়। এমন সময়েই একদিন অলগখণ্ড মুক্তিমোর্চা সম্বন্ধে নিবন্ধ লেখার জন্য চলে আসে শ্যাম মেহ্‌রা।

শ্যাম মেহ্‌রা এক প্রবীণ ও ঝানু সাংবাদিক। একচল্লিশ বছর সাংবাদিক জীবন কালে সে তেরোটি চাকরি নিজে ছেড়েছে, চারটি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তার জীবনের এক স্বভাবোচিত ঘটনা হল, চেট্টিয়ার গ্রুপের উত্তর ভারতীয় সাপ্তাহিকে কাগজের মালিকের কেচ্ছাকাহিনী উদ্‌ঘাটন। এ ছাড়াও সে অনেক দরকারী কাজ করেছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যমন্ত্রী, ঝানু বড় অফিসার ও রাজ্যপাল, বড় ব্যবসায়ী ও প্রখ্যাত বিশ্বধর্মগুরু, সকলের ব্যাপারেই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গেছে। বর্তমানে সে সব আর করে না। বউ ও মেয়ে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর থেকে মেহ্‌রা অনেক ঠাণ্ডা ও শান্ত হয়েছে। কয়েকটি কাগজে স্বদেশে ও বিদেশে লেখে এবং বাকি সময়ে মাছ ধরে বেড়ায়। কেন ধরে তা জানা যায় না, কেন না মেহ্‌রা মাছ খায় না।

মেহ্‌রা শেঠনার কাছে বসে জেনে নেয় কোথায় যেতে হবে, কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারপর বেরিয়ে যায়।

সেই যে যায়, আর তার দেখা নাই। শেঠনা আবার তার নতুন দপ্তরে ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়তে নামতে বাধ্য হয়। কেন না আপাদ-মস্তক রূপোর গহনা পরিহিতা জনৈক তুরন্ত ফ্যাশানী মহিলা তাকে উদ্ব্যস্ত করে মারেন। শেঠনা ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর থেকে কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করলেই তিনি স্টেনলেস স্টীলের বাসনবর্তন তৈরীর

কারখানা চালু করবেন।

শেঠনা গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প মানে স্টেনলেসের বাসনবর্তন নয়।

মহিলা বলেন, আপনি তো আমার কথাই বোঝেন নি। আমি তো ক্ষুদ্র শিল্প মানে ছোট ছোট, ঘর সাজাবার খেলনা বাসন বানাব।

তবুও শেঠনা থামে না। মহিলা কেঁদেকেটে চলে যান। শেঠনা এবার বোঝে, রঙ্গমঞ্চে ঢুকবেন সেই মন্ত্রীটি, যাঁর মদতে মহিলার এই শিল্পোদ্যোগ।

এই সময়েই তার ঘরে ঢোকে মেহ্‌রা। হুশহাশ করে চা খায়। বলে জঘন্য নদী সব। একটা নদীতেও মাছ ধরে সুখ নেই।

—ওখানেই ছিলে ?

—ঘুরছিলাম।

—চেহারা ভাল হয়ে গেছে।

—হতেই পারে। এত হেঁটেছি।

—ওদের কথাবার্তায় কি মনে হল ?

—সব ঠিক আছে।

—কেমন করে ?

—লড়াই হবে। সুরজ গাগরিয়া একটা ভাল নেতা। অবস্থা খুব ঘোরালো, টেম্পো খুব উঠেছে।

—ঠোকাঠুকি হবেই, তাই না ?

—প্রচণ্ড ঠোকাঠুকি হবে !

—অবশ্যই।

শেঠনা বুঝতে পারে কি হবে। সে আর কথা বলে না। সব কিছু, এই বিশাল ঘর, টেবিল, ফাইল, টাইপরাইটারের খটাখট সব মিথ্যে মনে হয়, নিরর্থক। প্রহসন।

অথচ এ সংঘষ অবশ্যম্ভাবী। কেন না বিহার শুধু উচ্চজাতি নিম্নজাতিতে বিভক্ত নয়, বিহার বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণে। দক্ষিণ-পূর্ব বিহারকে নিঃস্ব করে তার রক্তপান করে বিহার রাজ্যে রাজকোষ

স্ফীত হয়। নিয়ম। কেন না দক্ষিণ-পূর্বে থাকে কালো রঙের আদি-বাসী, গরীব নিম্নবর্ণ, তারা মরুক, উচ্ছন্নে যাক, তাদের রক্ত শুষে যে টাকা ওঠে জঙ্গল-খাদান-খনি থেকে, তার এক-শতাংশও তাদের জন্য বরাদ্দ নয়।

তাই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

আর, বনরাজপুরের জমায়েতে অলগখণ্ড নেতা রাম পুতি সে কথাই বলে।

—সংঘর্ষ হবেই। চেরো বাঁধ প্রকল্পকে জান দিয়ে রুখতে হবে। যে রুখবে না সে কোলহা নয়।

এখন সুরজের মনে হয়, বিরজিলুহাতুতে যে গুদামঘর উঠছে, সে তো নিশ্চয় চেরো বাঁধ প্রকল্পের ব্যাপারেই হবে। সুরজ ও চাঁদো পুতি শও খানেক লোক নিয়ে চেরোতে ফেরে এবং ফেরার পথে সুরজ বলে, দাঁড়াও।

ওরা দাঁড়ায়।

সুরজ একটি মানচিত্র মেলে ধরে। সার্ভে বিভাগের এ ম্যাপ চাঁদো পুতি জোগাড় করেছে। সুরজ বলে, বাঁধ প্রকল্পে এইসব গ্রাম-ইলাকা-ক্ষেতী মার খাচ্ছে। এটাই ওদের পরিকল্পনা।

—সুরজ! কা কিয়া যায়?

—এই ইলাকায় ওরা যা বিলডিং বানিয়েছে আর বানাচ্ছে তার কোনটাই পি ডবলিউ ডি'র নয়। পি ডবলিউ ডি যে শুনেছিলাম, সেটা ধোঁকাবাজি।

—সবই ধোঁকাবাজি!

ভাই সব! আমরা সেই বীর কোলহা, যারা এক সময়ে মোগলকে রুখেছে, এক সময়ে মারাঠাকে, আর ছোটনাগপুরের রাজা দৃপনাথ শাহী, জগন্নাথ শাহী, সিংভূমের রাজা, খরসোঁয়ার ঠাকুর, বামনঘাটির মহাপাত্র, কাকে রোখে নি, কাকে হারায় নি? রোটাসগড় থেকে ওড়িশা সীমান্ত অবধি এই যে জঙ্গলদেশ, পুরানো সরকারী রেকর্ডেও যাকে "ঝাড়খণ্ড" বলছে, আমরা তো তারই সন্তান।

—নিশ্চয় আরো বলো।

—কালবিদ্রোহে সুরগা আর সিংরাই তো আমাদেরি পূর্ব-পুরুষ। না কি, বলো?

—একশো বার।

—তাহলে। তাদেরি সন্তান তোমরা। আর এখন জিগ্যেস করছ কি, করব, কি করব। পথে পাথর থাকলে আমরা উখাড়ে ফেলে দিই, দিই না?

—তাই তো দিই।

তা বিরজিলুহাতু বা টোপাগাড়া, যেখানে যা দেখছ গুদামঘর, চাই অন্য কিছু, তা রাখার দরকার কি? ওগুলো থাকবে কেন?

সদ্য সদ্য মিটিংয়ের গরমে তখনো কোলহা শবীর গরম ছিল। বিরজিলুহাতুর বিশাল গুদামঘরটি ভাঙার জন্যে সবাই দৌড়য়।

চাঁদো ও সুরজ এ-ওর দিকে তাকায়। চাঁদো বলে, একষট্টিটা গ্রামের মানকি কে, মুণ্ডা কে?

—কালু সুমরাই ভালো জানবে।

—গ্রামের নাম দিয়ে তাদের কাছে ঘোষণা পাঠাতে হবে।

—কে পাঠাবে?

শ্রাবণের আকাশে ভাঙা ভাঙা মেঘ ছিল। মেঘের ওপরে বিকেলের আকাশ। সুবর্ণে চারদিকে ঘাস. গাছের পাতা ঝলমলে, বাতাসে সোঁদা গন্ধ। কোথায় ঘরের পানে চলা গরুর গলায় থরকি বাজে। কানে আসে কোনো মায়ের চীৎকার, কোথা গেলি, বুধা? আয় ঘরে, আজ তোকে মজা দেখাচ্ছি।

সুরজ কান পেতে শোনে। মাথা নেড়ে বলে, মায়েরা চিরকাল দেখায়, মজা দেখায়। আমার মা আমাকে ঠিক এমনি করে ডাকত আর আমি দৌড়ে এসে তার হাত দুটো পিছন থেকে চেপে ধরে ঝুলে পড়তাম।

—এখন তেমন করলে পার?

—এখন তো মা পেয়ে গেছে নতুন সঙ্গী, তার নাতনি, এখন আর আমার দিকে মন নেই তত।

চাঁদো বলে, চলো চেরোর পাড় ধরে হাঁটি।

আষাঢ়ে জল হয়েছে, জল হয়েছে শ্রাবণে। চেরোতে এখন জল চলে খরস্রোতে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এ জল কত না ঘোলা আর হিংস্র। তা কিন্তু সত্যি নয়। বৃষ্টি হবার সময়ে জল গেরুয়া। তখন আশপাশের মাটি ধুয়ে জল নামে।

বৃষ্টি যখন পড়ছে না তখন নামো, আঁজলা ভরে জল তোলো, দেখবে জল যেন কাচ। গেরুয়া বালির বুকে বইছে বলে জল রাঙা দেখায়।

সুরজের মনে হয়, কোলহান তো কোন শব্দ নয়। কোলহান মানে চেরোর বহে চলা স্রোত, ঘরে ফেরা গরুর গলার থরকি, ঘর-পালানো ছেলেকে ঘরে ফিরাতে মায়ের গলার ডাক। কালহান মানে সার্জোমবাহ্ পরবে শালফুলের গন্ধ, পাকা গোরো ধানের সুবাস, কোলহা মায়ের পিঠে বাঁধা শিশুর চোখের নিষ্পাপ চাহনি।

এই কোলহান এক দুঃখিনী জননী। পাহাড়ে, জঙ্গলে, শস্য-ক্ষেত্রে খনিতে, খাদানে তার আঁচল বিছানো। সব থাকতেও সে নিঃস্ব। কোলহান তো কিছু বলে না, সে শুধু চেয়ে থাকে সন্তানদের দিকে।

এই কোলহান আমার, আমার, সুরজ মনে মনে বলে। বুকের নিচে বড় আকুলতা।

ছোট একটি পাহাড়, তারপর চেরো। চেরো গ্রামে সুরজের ঘরই প্রথম বাড়ি।

—আজ কি বারহা ফিরতে পারবে চাঁদো? আজ রাতে আমার ঘরেই থাকো।

সুরজের অবস্থা এখন, স্বসমাজ আন্দাজে, যথেষ্টই ভালো। সব টাকাটা ও জমিতেই লাগিয়েছিল। লাগাতে বাধ্যই হয়েছিল।

টাকাটা ও মা এবং নান্দিকে দেয়। নিজের বলতে একটি ১২ বোরের একনলা বন্দুক, একটি সাইকেল ও একটি ব্যাটারি রেডিও।

বন্দুক ওর নিজের জন্যে, গ্রামের জন্যেও। গ্রামে কারোই বন্দুক নেই।

সাইকেলটা চাঁদো সুবিধেয় কিনে দিয়েছে। সাইকেল ছাড়া ও এখানে-ওখানে ঘুরত কেমন করে?

রেডিওতে খবর শোনা যায়, গান তো আছেই।

মা আর নান্দিকে ও সাফ বলেছিল, আমার কাছে কিছু রাখলাম না। আমাকে তোমরা শুধু খেতে দেবে, আর অলগখণ্ডের কাজ করতে দেবে।

চেরো গ্রামের লোকজন কোনদিনই আক্ষরিক অর্থে ভূমিহীন নয়। পাঁচ-তিন-ছয় বিঘা জমি সকলেরই আছে।

"বেরা" হল নাবাল জমি, যা গড়ানে জল পায়, ফলে সারা বছর কিছু না কিছু চাষ হয়।

চেরোর জমি 'বেরা' জাতের নয়।

বাদ জমি হল বেরার উপরের জমি। তাতেঁও ধান, মকাই, রবি, নানান চাষ হয়।

চোরের জমি "বাদ" জাতের নয়।

"গোরা" হল ডাঙা জমি। তাতে হবে গোরা ধান, তার ফলন খুব কম। আর হবে সরগুজা, মুগ, উরিদ।

চেরোর জমি গোরা।

খানিক জমিতে চাষ। বাকি সময় গ্রামের লোকদের ভরসা। বনের কাঠ, ফল বীজ।

চেরোতে সাহুরা, যারা মহাজন, তারা ঢুকতে পারেনি। কিন্তু যমুনা বুড়ির নাতি যখন ঠাকুমাকে নিয়ে যেতে চাইল টাটানগর, তার কর্মস্থলে, যমুনা তার দশ বিঘা জমি কিনে নেবার জন্যে গঙ্গাকে ধরে পড়ল।

নাও, তোমরাই নাও। নইলে রামপুরের চৈতন সাহু তো আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। শেষে কি গ্রামে দিকু ঢোকাব? তোমরা ছাড়া জমি কেনার লোক কোথায় গ্রামে?

গঙ্গা ছেলেকে বলল, এ জমি কিনতেই হবে নইলে সাহুরা নিয়ে নেবে।

—মা। যা চাও করো না কেন?

গ্রামের মুণ্ডার সামনে কেনাবেচা হয়ে যায় জমি। জমি এখন সুরজের অনেকটাই। তার জমিজমা আছে, সে ফৌজে ছিল, এখন সে অলগখণ্ডী, অঞ্চলে সে নেতা। ফলে দেয়ালে আছে হিন্দীতে নাম লেখা কাঠের ফলক। এটি নান্দির শখে।

নান্দি যেমন পরিশ্রমি, গঙ্গা তেমনি সংসারী। এতটা জমিজমা ওদের, এখন পয়সা হবার কথা।

কিন্তু সুরজের ঘরে আজকাল উনুন নেভে না। লোকজন আসছেই। যে আসছে সে খাচ্ছে, থেকে যাচ্ছে। গঙ্গা আর নান্দি দুজনেরই খাটনি বেড়েছে খুব। তাতে ওরা কাতর হয় না। সুরজ বলে দিয়েছে, মা! তোমার ঘরে আছে তাই মানুষ খাচ্ছে। আমার মেয়েও এ সব দেখুক। ওকে তো জানতে হবে যে সংসারে দশজন-কে নিয়ে চলতে হয়।

নান্দি বলে, তা ও শিখে যাবে।

সুরজ বলে, ওকে তো আমি লেখাপড়া শিখাব। অনেক পড়াব, উকিল বানাব।

—কেন? উকিল কেন?

—আদিবাসীদের হয়ে কেস করবে।

গঙ্গা বলে তোর বাবা বেঁচে থাকলে আজ কত খুশি হত। সে তো এমন সব কাজই ভালবাসত। তোর দাদু থাকলেও কত আনন্দ করত। এই তো চাই। এবাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষই নিজের-টুকু নিয়ে বসে থাকেনি। সবাই সমাজের পাঁচজনের জন্যে ভেবেছে।

সুরজ বাড়িতে চাঁদো পুর্তিকে আনে নির্দ্বিধায়। বাড়ি এসে দেখে উঠোন বোঝাই লোক।

—কি হল? কিছু হল?

কালু সুমরাই বলে, তোমার জন্যে বসে আছি।

—কিছু হয়েছে?

—সুরজ! আমাদের মন বলছে যে বহোত বলোয়াতি করে এরা চেরো বাঁধপ্রকল্প চালু করবে।

—কেমন করে? আমরা তাই মেনে নেব?

—সুরজ। ওরা বলোয়াতি করলে তবে বাধা দেব? না আগেই তৈরী হব?

ভাঙ্গা মেঘে চাঁদের আলো। কোলহানের সন্তানদের কালো কালো মুখে প্রশ্ন।

বানো গ্রামের মধু মুণ্ডা বলে—কোলহানে ওরা একষট্টিটা গ্রাম ডুবাবে আর মানকি-মুণ্ডাদের একবার জানাল না? ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন মনে করো। উইলকিনসনের ব্যবস্থার কথা মনে করো। এ আমাদের মস্ত অপমান হয়ে গেল। এমন অপমান কোল্‌হা সইতে পারে না।

—মিটিং তো হয়েছে।

—আমরা অলগখণ্ড বলতে তোমাকেই জানি। আমি একা নই। দশটা গ্রামের মানকি-মুণ্ডা আজ তোমার উঠানে। আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক লড়েছিল কোল্‌হানের জন্যে আর আজ চেরো বাঁধ প্রকল্প যে ইলাকা নিয়ে, এ বিশেষ করে তাদের বিপদ।

—হ্যাঁ, এ বিপদ আমাদেরই।

—আমরা ইলাকায় তোমাকে জানি। তুমি বীর, বীর কোল্‌হা। তুমি অনেক বড় তুনিয়া দেখেছ। তোমাকে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

এমনি করে। মেঘভাঙ্গা চাঁদের আলোয়, শ্রাবণের ভরা কোটালে, সুরজের উঠানে জন্ম নেয় চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি।

চাঁদো পুর্তি তার প্রেসিডেণ্ট।

সুরজ তার সম্পাদক।

সবাই মাথা হেলায়। হ্যাঁ, এই ভালো। তরুণরা নেতৃত্ব নিক। বৃদ্ধেরা আশীর্বাদ করুক। সুরজের পিতার প্রতীক করম গাছটি পাতার মর্মরে জানাক সানন্দ সম্মতি।

সুরজ মাথা তুলে তাকায়। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে নান্দি।

—তাই হোক, তবে তাই হোক। সুরজ বলে। নান্দি চেয়ে থাকে। চেয়েই থাকে।

॥ ছয় ॥

চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতির ঘোষণা এখন পৌঁছতে থাকে গ্রাম হতে গ্রামে। কোথাও কোনো কুটিরে কাজ করতে থাকে শিক্ষা-প্রাপ্ত ছেলেরা। কাঠের বোর্ডে ক্লিপ এঁটে কার্বনে কয়েক কপি একসঙ্গে টোকা হতে থাকে। কালু সুমরাই চোখে মোটা কাঁচের চশমা এঁটে বলে যায় কি লিখতে হবে। হাঁ হাঁ, কালু আর কিছু না পারুক, এ কাজ খুব পারে। আর ছাপিয়ে তো নেয়া যেত রামপুরে মহাবীর প্রেসে। কিন্তু তা করতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে।

"গ্রামবাসীরা। এ নির্দেশ চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতির হুকুম বলে মানবে।

চেরো বাঁধ প্রকল্পের জন্যে বানো, বিরজিলুহাতু, টোপাবুরু, যেখানে কোনো আপিস বা কোয়ার্টার তৈরী হবে বা হচ্ছে, সেখানে রেজা, কুলি, মুনিশ, মিস্তিরি, ছুতার, চৌকিদার, ঠিকাদার কাজে কেউ লাগবে না। যারা টোপাবুরু বাঁধ প্রকল্পে কাজ করছ বা করবে বলে ভেবেছ, তারাও এ হুকুমত মানবে। সংঘর্ষ সমিতি দিনে-রাতে তোমাদের ওপর নজর রেখেছে, আর যারা এ হুকুমত অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যারা গরীব, রোজগারের জন্য ব্যাকুল, তারা টোপাবুরু প্রকল্পের কাজ ছেড়ে দাও। চলে যাও অন্যত্র। চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি কা তোমার/শুধু তোমাদের অভাবের কথা ভাবে না। এই সমিতি লক্ষ লক্ষ লোকের কথা ভাবছে।" এ সমিতি বাঁচাতে চাইছে কোল্হান ভূমিকে, তার জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে।

আমার বিশ্বাস, তোমরা এ হুকুমতের গুরুত্ব সম্যক বুঝতে পেরেছ।

স্বাক্ষর :—

সুরজ গাগরাই
মহাসচিব,
চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি।"

ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে কোলহান ও পোরাহাটের মুণ্ডা সমিতি। এমন একুশটি জায়গায় পাঠানো হয় অন্য ঘোষণাপত্র।

"একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন। হইতে—

কোল্‌হানের বীর কোল্‌হাগণ! প্রতি—

ভারত সরকার, বিহার রাজ্য সরকার, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার, ওড়িশা রাজ্য সরকার!

সকল রাজ্যের মন্ত্রীরা, ভারত সরকার এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসাররা, নিম্নলিখিত বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

চেরো নদীর ওপারে টোপাবুরু বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে এবং রাজ্য সরকার ইলাকার মানুষদের কাছে কোনো অনুমতি নেয়নি। এটি ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা প্রজাস্বত্ব আইন-বিরোধী কাজ। এই আইন অনুসারে, স্থানীয় বাসীন্দাদের অনুমতি ব্যতি-রেকে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা ও কোলহানে সরকার পারে না কোন প্রকল্পের কাজ হাতে নিতে। রাজ্য সরকার যদি তেমন কাজ করে তাহলে কোলহানে প্রচলিত উইলকিনসনি ব্যবস্থা ও ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন, দুয়ের বিরোধিতা করবে।

ছোটনাগপুর ইলাকায় বসবাসকারী সরল মানুষদের জমি রক্ষা করার জন্যই ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়। কোলহানও পোরাহাটের একাংশ ছোটনাগপুরের অন্তর্গত। ১৮৩৭ সাল থেকে এখানে চলছে উইলকিনসনি ব্যবস্থা। এর ফলে ভারতের বাকি অংশ থেকে এ জায়গায় সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা পৃথক ও বিশিষ্ঠ।

কোলহান আর পোরাহাট ইল্যাকায় যারা থাকে, তাদের জন্যেই এ ব্যবস্থা প্রণীত হয়। এ ব্যবস্থা ভারত সরকারের নয়। ব্রিটিশ সরকারের তৈরী। এর ফলে মানকি-মুণ্ডা শাসনব্যবস্থা এখনো চলছে। এ ইলাকায় জমির মালিক মানকি ও মুণ্ডারা। তাই, মানকি, মুণ্ডা ও স্থানীয় আধিবাসীদের অনুমতি, পরামর্শ অথবা মতা-মত না নিয়ে এখানে সরকার কোন প্রকল্প চালু করতে পারে না। তা যদি করে তবে সরকার উইলকিনসনি ব্যবস্থা অমান্য করবে।

সরকারের সংকল্প যদি এই হয় যে ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন

ও উইলকিনসনি ব্যবস্থা সে অমান্য করবেই করবে, তাহলে আমরা, কোল্‌হারা বলব, দেশের স্বার্থে ১৮৩৫ সালে যে ভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করেছিলাম, তেমনি করে এ সরকারেরও বিরোধিতা করব।

সরকার জানুক যে এ দেশ বীর কোল্‌হাদের। সরকারের এ কথাও জানা উচিত যে ১৮৩৫ সালে বিদ্রোহ করে কোল্‌হারা ভারতকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পন্থা নির্দেশ করেছিল এবং আজ ভারত স্বাধীন।

ইতিহাসের সে অধ্যায় প্রসঙ্গে আমি আর বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করব না। ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন ও উইলকিনসনি ব্যবস্থা অমান্য করে, স্থানীয় অধিবাসীদের অনুমতি না নিয়ে রাজ্য সরকারকে টোপাবুরু বাঁধ তৈরী করতে দেওয়া যায় না।

এ আবেদনে সাড়া যতদিন না পাই, আমরা টোপাবুরু বাঁধ প্রকল্পের জন্য একটা ছোট্ট বাড়িও তৈরী করতে দেব না। এ হল স্থানীয় আধিবাসীদের মনের কথা। সকল মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে আমরা এ আবেদনের সুধী ও বিবেচিত উত্তর প্রার্থনা করি। কেন না এ প্রকল্পেব সঙ্গে যুক্ত কাজ চললে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়াতে পারে।

এ আবেদনপত্রের দ্বিতীয় কপিটি অনুগ্রহ করে স্বাক্ষর করুন ও যথাশীঘ্র সম্ভব তা পাঠিয়ে দিন আমাদের অপিসে।

স্বাক্ষর : চাঁদো পুর্তি/প্রেসিডেণ্ট
চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি।
স্বাক্ষর : সুরজ গাগরাই/সম্পাদক,
চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি।"

এখন জেলার ডি সি সক্রিয় হয়। ফলে এ চিঠির এক কপি পাটনায় কোনো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায় পৌঁছে যায় এবং কপালে কোঁটা কাটা যুবক অফিসার ব্যাপারটির কিছুই বোঝে না। কিন্তু সে আজ এ চেয়ারে বসেছে সম্পূর্ণ রাজনীতিক মদতে। রাজনীতিক প্যাঁচপয়জার সে ভালই বোঝে। সে ডি সিকে নির্দেশ পাঠায়,

"সংঘর্ষ সমিতির বিরুদ্ধে যাবে এমন কিছু আদিবাসী জোগাড় করো। অরুণ সুমরাইয়ের সমর্থকদের মধ্যে পেয়ে যাবে।"

অরুণ সুমরাই কংগ্রেস-ই দলের রাজ্যসভা সদস্য। গরীব আদিবাসীর মধ্যে তার খুঁটি অতীব দুবলা।

এরপর যুবকটি টেলিফোনে ডি সিকে নির্দেশ দেয়। লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প কতকগুলো শয়তানের জন্যে মার খেতে পারে না। এই টোপাবুরু বাঁধ প্রকল্প যেমন চেরো বাঁধ প্রকল্পের অন্তর্গত, এ সবই হল সেই সুবর্ণরেখা বহুমুখী প্রকল্পের অঙ্গ। সুবর্ণরেখা বহুমুখী প্রকল্প বিহার রাজ্যের হাতে কোহিনূর। কোহিনূরকে হাতছাড়া করা চলে না। পুলিশ কি করছে? এই সুরজ গাগরাই, চাঁদো পুর্তি, এদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক ষড়যন্ত্র প্রমাণ করা কি এতই কঠিন? এরা কারা? কোন্ শয়তান? অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চা নামক কারখানায় তৈরী মাল?

ডি সির কাতর উত্তর ভেসে আসে, সুরজ গাগরাই ফৌজে ছিল। সে চমৎকার সার্ভিসের জন্যে মেডেল, সার্টিফিকেট পেয়েছে। কোলহারা তাকে "নেতা" বলে।

—বাঁধের কাজ চালাও। বলে যুবকটি ফোন ছেড়ে দেয়। না না। আজ যেতেই হবে জ্যোতিষীর কাছে। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ দিয়ে তাবিজ পরে, রোজ লক্ষবার জপ করে এবং সোমবারে নিরামিষ খেয়ে, শুক্রবার উপবাস করেও কিছুই ভাল হচ্ছে না। এ জন্য তার স্ত্রীকেই দায়ী বলে মনে হয়। স্ত্রীর অন্তরে যদি ভক্তি থাকত, তাহলে সে দশ বছরে সাতটি মেয়ে প্রসব করত কি? সে নিজে দহেজ নিয়েছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। এ সাতটা মেয়ের বেলা তো বাজার আরো চড়বে। তখনকার কথা ভেবে তার সত্তর লাখ টাকা জমানো উচিত। কয়েকটা বহুমুখী প্রকল্পে লেগে থাকতেই হবে।

ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন! উইলকিনসনি ব্যবস্থা! এসব শব্দের মানে কি? তার মানে হয় এ শব্দগুলি সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা,—সেই অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চায় তৈরী। সত্যাসত্য জানার জন্যে সে অতীব অপ্রীতিকর, প্রশাসনের চক্ষুশূল, চূড়ান্ত নাস্তিক শেঠনার

কাছে যায়। যুবকটির মতে ভারতের সংবিধানে একটা বয়ান যোগ এখনি দরকার। নাস্তিক লোকদের কখনোই দায়িত্বপূর্ণ পদে রাখা চলবে না।

এবং শেঠনার ঘরে ঢুকেই সে দেখে গণেশজীর একটি পেতলের মূর্তি দিয়ে জনৈক মুসলিম লিখিত একটি বই ছাপা দেয়া আছে। দেখে তার অন্তরাত্মা রি রি করে ওঠে। তবু কোন কথা না বলে সে সরাসরি প্রাসঙ্গিক বিষয়টিতে চলে যায়।

—শুনেছেন কি চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি হয়েছে একটা? দেখুন. তারা কি লিখছে।

—মেহরা লিখেছে এই কাগজে।

—ওঃ! জার্ণালিস্ট!

সাংবাদিকদের অত তুচ্ছ করবেন না। মহারাষ্ট্রে কি হয়ে গেল তা দেখলেন না?

—বিহারে তা হবে না।

হ্যাঁ। বিহারের ক্ষমতা আছে, অমন দশটা ব্যাপার হজম করে নেয়।

—কি লিখেছে?

—পড়েই দেখুন।

—কি লিখেছে?

—ওরা জমির বদলে জমি চায়।

—টাকা চায় না?

—না, কেন চাইবে? সরকার তো জমির চালু দরে টাকা দেবে না। অনেক কম দরে।

—আদিবাসীদের অত বাহানা কিসের?

—সরকার যা দেবে, তাতে তো ওরা বদলি জমি কিনতে পারবে না। ক্ষেতী না করলে কি খাবে?

—এ ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন কি সত্যিই আছে, না ওরা বানাচ্ছে?

—১৯০৮ থেকে আছে।

—উইলকিনসনের ব্যবস্থা ?

—১৮৩৭ থেকে আছে।

—কোলহানের এত প্রাধান্য কেন ?

—কোলহানের ইতিহাসের জন্য।

—বীর কোল্‌হা কারা ?

—কোলহানের মানুষরা।

—তারা এমন একটা প্রকল্পে বাধা দেবে ?

—ওরা বলছে, ওদের জানানো হয়নি।

—সরকার জানাতে বাধ্য নয়।

—তা আমি জানি না।

—এরা দাগাবাজ, ডাকু না কি ?

—না না, খুব ভালো, খুবই ভালো।

—আপনাকে জিগ্যেস করাই ভুল।

—ঠিক বলেছেন।

যুবকটি রেগে বেরিয়ে যায়। অথচ, মঙ্গলবার ওর রাগ করা বা বিবাদ করা বারণ। জ্যোতিষীর কড়া নির্দেশ। এখন জ্যোতিষীকেই বলে দিতে হবে। কি ধারণ করলে, কোন্ কবচ বা রত্নের কৃপায় সে মঙ্গলবার ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, জিঘাংসু হওয়া থেকে রেহাই পায়। যুবকটি ঘরে ঢোকে এবং তার বেয়ারাকে মধুঢালা স্বরে এক গেলাস জল দিতে বলে। আজ মঙ্গলবার।

আর কোলহানে কোথাও সুদূর দুর্গমে ধিকিধিকি আগুন ছড়াতে থাকে। সদর শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার যাও। তারপর পার হও চেরোর উপরে বীরসা সেতু। চেরো এখানে খাদের মধ্যে বইছে। সেতুটি ছোট। অরুণ সুমরাই এ সেতুটি নিজের নামে উৎসর্গ করতে চেয়েছিল। তার দলীয় নেতারা খিঁচিয়ে বলেছে—বীরসা সেতু নাম হবে। বীরসাও আদিবাসী ছিল আর খুবই ভরোসার কথা যে, সে মরে গেছে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে। তার নামে সেতু হলে আদিবাসী লোক কিছু খুশি হবে।

বীরসা সেতু পার হও। পাকা রাস্তা। অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চা যখন থেকে শিকড় ছড়াচ্ছে, তখন থেকে সদর থেকে দূরদুর্গম এলাকায় পৌঁছতে রাস্তা হচ্ছে একের পর এক। কোনো ইলাকাকে অত দূরে ফেলে রাখা ঠিক নয়। এ সরকার আদিবাসী আর গরীবের সরকার। যত রাস্তা বনবে তত রেজা লোক, কুলি লোক কাজ পাবে। অলগখণ্ডীরা বলে, আর তোমাদের ঠিকাদার কংক্রিটের রাস্তায় বরাত নিয়ে ছয় ইঞ্চি সিমেণ্ট, পাথরকুচিতে রাস্তা বানাবে।

—এ রাস্তা আদিবাসী জীবনে সুখ আর সমৃদ্ধি পৌঁছে দেবে।

—সরকারী ঘোষণা।

—এ রাস্তা আদিবাসী জীবনে পুলিশ আর মিলিটারী জীপ ঢুকাবে—অলগখণ্ডীদের মন্তব্য।

বীরসা সেতু পেরোলে, পাকা রাস্তা পেলে। তারপর পেলে কাঁচা রাস্তা। কোলহানের পেটের মধ্যে ঢুকছ। দুপাশে দূরে দূরে ধূলিধূসর গ্রাম, ছোট ছোট বৃক্ষ, কিছু জঙ্গল, শস্যক্ষেত্র। পথের দু-পাশে প্রাগৈতিহাসিক বড় বড় পাথর মাঝে মাঝেই ঝুঁকে আছে। এরা এ অঞ্চলকে যেন পাহারা দিয়ে আড়াল করে রাখতে চায়। হায়! সিংভূমের প্রকৃতি কত অসহায় লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন পাথর-প্রহরীরা পারে নি কোলহানকে তার সন্তানদের, নেকড়ে, হায়েনা, শকুনের চেয়ে অনেক হিংস্র ও চতুর বহিরাগতদের থাবা থেকে বাঁচাতে। তারা উন্নততর হাতিয়ারে সেজে কেবলই ঢুকে গেছে কোলহানের গহনে গভীর।

তারা কখনো তীরধনুক ধরে না। বন্দুকও ধরে না। অন্যদের দিয়ে বন্দুক ধরায়।

তাদের হাতিয়ার আইনের জটাজাল। ভোটের ভুয়া রাজনীতি যে ছেঁড়া মুখোশের মতই লুকানো মুখ ঢাকতে অক্ষম। তাদের সেনাবাহিনী ঠিকাদার ব্যবসায়ী, মহাজন, অফিসার, দালাল; ভাঁওতা-বাজ, রাজনীতিক ব্যক্তি ও দল এবং অবশ্যই পুলিশ ও ফৌজ।

ওদের থাবা কোলহানের যে অঞ্চলে সম্পূর্ণ গেড়ে বসেনি, সেই সব সুদূর দুর্গমে বিক্ষোভ ধিকিধিকি জ্বলে। বিশ্ব ব্যাংক, পাটনা

প্রশাসন, সিংভূম প্রশাসন, ঠিকাদার বাহিনী, ফায়দালোভী রাজনীতিক মানুষ, এত বিরোধিতার সঙ্গে তারা কোন্ হাতিয়ার নিয়ে লড়বে।

কাঠ, পাতা, খড়কুটোর মত শব্দও অনেক সময়ে ভীষণ দাহ্য হতে পারে। এখন বারুদে মাখানো দাহ্য কথার টুকরো ছড়ায় বাতাসে, ছড়ায় হাতু থেকে হাতু, বুরু থেকে বুরুতে, বন হতে বনে, প্রান্তর থেকে প্রান্তরে।

অনেককাল পরে স্মৃতিতে অবসিত, রক্তে বাসা বেঁধে থাকা প্রাচীন বিদ্রোহ-নেতাদের নামগুলি আবার ফিরে আসতে থাকে কোলহানে।

কোনো কাঁচা রাস্তার ধারে পাথরের গায়ে লেখা দেখা যায়, "বীর সুরগা সড়ক।"

সুরগা ১৮৩১-৩২ সালের কোল-বিদ্রোহের নায়ক। ওই বিদ্রোহের আরেক নায়ক সিংরাই এতকাল বাদে ঘুরে ফেরে,—যখন উদ্ধত, মাতা উঁচু টোপাবুরু পাহাড়ের পাদদেশে কাঁচা হরফে সাদা রঙে লেখা হয় "সিংরাই বুরু"।

রাঁচি জেলের অন্ধকার ঘর থেকে বীরসা মুণ্ডা উঠে আসে আবার। সরকার তার নামে কলেজ, পথ, সেতু, যাই করুক,—তাতে তো তার মন ভরে না। বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী আদিবাসীরা ডাকলে তবে তো তার মন ভরে। ছোট্ট কোনো খুঁটকাট্টি বনের দুয়ারে প্রহরীসদৃশ শালগাছের গায়ে লেখা হয়ে যায় "বীরসা অরণ্য"। এখানে বীরসা ধরা দেয়।

বড় দাহ্য শব্দগুলি, বড় প্রচণ্ড তাদের ক্ষমতা।

—আদিবাসী লোক। সরকার তোমাদের উখাড়ে ফেলবে তোমাদের হাতু, ক্ষেতি-জমিন থেকে। চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতির কথা শোনো।

—আদিবাসী লোকে! সরকার তোমাকে একশো টাকা যার দাম, তার জন্য দশ টাকা, এমন হিসাবে টাকা দেবে। তাতে না জমি, না বাস্তু, কিছু হবে। সে টাকাও চামচা আর পিট্টুর দল

ধোঁকা দিয়ে বাটাই নেবে। তোমরা বালাবালু হয়ে ছিটকে বেড়াবে এখানে সেখানে। চেরোর বুকে গরম বালি যেমন বাতাসে উড়ে বেদিশা হয়, তোমরাও তাই হবে।

—আদিবাসী লোক। সরকার তো কোলহানের পিঠের শিরদাঁড়া ভাঙ্গতেই চায়। তোমাদের নিয়ে যাবে উত্তর বিহারে। উত্তর বিহারে ক্ষেতি-কিষাণের হক নিয়ে যে লড়ে তাকেই ওরা মেরে দেয়। এখনি তো সিংভূমের লোক উত্তর বিহারের ইটাভাটায় বন্দী গোলাম হয়ে পড়ে থাকছে। অলগখণ্ড ইলাকার কোল্হাদের পেলে উত্তর বিহারের বড়লোকরা তাদের কালো চামড়া ফাটিয়ে লাল রক্ত দেখবে।

ভীষণ, ভীষণ দাহ্য সব শব্দ ও বাক্য। এখন সুরগা ও সিংরাই, প্রাচীন নায়করা এসব শব্দে আবার বেঁচে উঠতে থাকে। আবার অরণ্যপ্রহরী বীরসার নাম শুচি হয়ে ওঠে।

শব্দে আগুন থাকে। এখনো চেরো বাঁধ প্রকল্পের আওতায় মাত্রই কয়েকটি গুদাম, কোয়ার্টার ও আপিস বাড়ি উঠেছে কয়েক জায়গায়।

যারা সেগুলি করছিল, তারাই সেগুলি ভেঙ্গেচুরে একদিন চলে যায়। যাবার আগে কাগজে লিখে যায় ঘোষণা, প্রকল্প বন্ধ, কাজ হবে না।—চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি।

খবরের কাগজে লাল আলতায় লেখা এমন সব বিশ্রী শব্দ সাইট ইঞ্জিনীয়ারদের স্বাগত জানায়। একটি কাগজে ইংরেজি হরফে হিন্দী ভাষায় লেখা থাকে, সরকারের পিট্‌ঠু সাইট ছাড়ো।

সাইট ইঞ্জিনীয়াররা ঘাবড়াতে থাকে। এবং বিরজিলুহাতু সাইটে তিনটি গুদাম ভেঙ্গে যখন ধূলিসাৎ করা হয়, তখন সদরে ডি সি একদা অপরাহ্নে কয়েকজন ধূলিধূসর কাকতাড়ুয়াসদৃশ লোককে দেখে যথেষ্ট চমকিত হয়। বুধবার বলেই তাঁর চমকটা বেশি লাগে।

—আমরা চেরো বাঁধ প্রকল্পের সাইট ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলে আমরা কোনমতেই সাইটে যাচ্ছি না।

—কেন? কি হয়েছে?

—তোমার জানা উচিত। তোমাকে ফোন করেছিলাম।

—ও! সুরজ গাগরাই।

—মিস্টার ডি সি! জেলাতে তোমার শাসন চলতে পারে, কিন্তু আমাদের কাজের ইলাকায় একেবারে সুরজ গাগরাইয়ের রাজত্ব চলছে। এটা ঘটনা।

ডি সি পাটনায় লাইন চায় এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়।

বুধবার এ কি হাঙ্গামায় পড়া গেল?

"বুধবার" শব্দটির তাৎপর্য আছে। বিহারে অধিকাংশ উচ্চবর্ণ অফিসার ও বেসরকারী মানুষ, বাঙ্গালী, বিহারী, নির্বিচারে, যদি সে বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, তাহলে মাসে দশ হাজার লোকও সপ্তাহে রোজ খেতে পায় না।

কেন না এরা কেউ নিজের মালিক নয়। সাঁইবাবা, সন্তোষী মা, ভোলাগিরি, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, অনুকুল ঠাকুর, মোহনানন্দ, আনন্দময়ী মা, কাঠিয়া বাবা, ফলাহারী বাবা, এমন কোনো না কোনো ধর্মগুরু বা গুরুণী এদের মালিক। ফলে ভক্তরা সপ্তাহে সাধারণত একদিন উপোসী থাকে।

ডি সি যাঁকে ফোন করবে, তিনি দর্পহারী লাঠিয়াবাবার শিষ্য। লাঠিয়াবাবা ক্রোধী গুরু। তিনি সাধারণত তাঁর লাঠি চেপে শূন্যমার্গে ঘোরেন। লাঠিয়াবাবার ভক্তরা বুধবার খায় না। বুধবার নিরম্বু, বৃহস্পতিবার দুধ ফল, শুক্রবার গুরুভোজন, শনিবার লঘুভোজন, রবিবার দুধ মিষ্টান্ন, সোমবার দুধ ফল, বুধবার নিরম্বু।

বুধবার লোকটা উপোস করে আছে। তার বাড়ির সামনে বিশাল হালোয়াই দোকান। তাতে থরে থরে সাজানো বাংলার রসগোল্লা, বেনারসী কালাকন্দ, এলাহাবাদী গুলাবজামুন, দিল্লীর সোহনহালুয়া, আরো কত কি! বাতাপি, ক্ষীরের মালাই, উৎকৃষ্ট রাবড়ি। সে লোক মিষ্টিভক্ত। ফলে বুধবার সে জ্বলে থাকে।

তাকে আজ ফোন করে এমন কথা বলতে হবে! লাইন পেতেই সে বলতে শুরু করে।

ওপার থেকে নির্দেশ আসতে থাকে। কলের পুতুল যান্ত্রিক গলায় চেঁচালে যেমন শোনায়, তেমনি গলা।

নির্দেশ শুনে ডি সি ফোনটি নামায়। না, এখন বি এম পি নামানোর সময় নয়। "গুয়া" নামটি প্রশাসনের বুকে এখনো দুষ্টক্ষত হয়ে জেগে আছে। তাছাড়া ফৌজী লোক ওই সুরজ গাগরাই। কিসে কে খচে যাবে কেউ জানে না।

পুলিশ এক্ষেত্রে অকেজো। সুরজ গাগরাই, চাঁদো পুর্তি বা চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও আনতে পারেনি।

অগত্যা সে অরুণ স্নমরাইয়ের জনৈক লোককে ডাকে। যান আপনারা ও অঞ্চলে। কথা বলুন আদিবাসীদের সঙ্গে। আপনি আদিবাসী, ওরা আপনাদের কথা শুনতে পারে।

লোকটি কথাগুলি মন দিয়ে শোনে। তারপর বলে—দেখুন, কংগ্রেসের ছাপ নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে কোনো লাভ হবে না। অন্যের কথা কি বলব? আমার নিজের ভাতিজাই বলছে। কাংরেসের নামে কোন আদিবাসীর বুকে সাড়া দেয় না। কেন কি, রাজ্যে তো কাংরেস সরকারই থাকে আর আদিবাসীর উপর গুলি তো কাংরেসের পুলিশই চালায়। এখন একটা সাচাই লড়াই হচ্ছে, আমি কি গিয়ে বলব, এ লড়াই ঝুটা?

—কেন বলবেন না?

—মিস্টার ডি সি। আপনি তো রাজনীতির কিছুই বুঝেন না। এখন ও কথা বললে কি হবে জানেন? যারা সংঘর্ষ সমিতিতে নেই, তারাও তাতে সামিল হয়ে যাবে।

—সাচাই লড়াই বললেন কেন?

—মিস্টার ডি সি, আদিবাসীরা লড়ছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। কোলহান তাদের অস্তিত্ব। আদিবাসীরা সকল লড়াই বুনো জংলীর গোঁয়ার্তুমি আর আপনারা যা করছেন সব ঠিক কাজ এ তো আমি হো হয়ে বলতে পারব না।

—কিন্তু।

—কাংরেসী যে সেও তো আদিবাসী। সরকারের চামচা আমরা তবু আদিবাসী রক্ত একটু কাঁদে আদিবাসীর জন্যে। যাক গে, এ কহানি খুবই জটিল। তাই বলি, আপনি কি চান? এ সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে?

—হ্যাঁ।

শেঠনাজীর কথা কেন মানলেন না আপনারা? চার্ট নিয়ে, ম্যাপ নিয়ে মানকিমুণ্ডাদের কাছে কেন গেলেন না তা বুঝি না। আপনারা ঘুমানো বাঘকে খুঁচিয়ে জাগান। ও মাটা গাগরাই তো চোর-ডাকু-দাগাবাজ-ধান্দাবাজ নয়। ও ফৌজী সিপাহী, আর খুব বিশিষ্টও ছিল।

—মাটা কে? এ তো নতুন নাম শুনছি।

—আরে যাকে আপনারা সুরজ বলছেন। আমি ওকে "মাটা" বলব। প্রথম বেটাছেলে। তোর নাম তো হবে তোর ঠাকুর্দার নামে। তুই "মাটা"। তোকে "সুরজ" বললেই আমি মানব?

—এখন কি করা যায়? কাজ তো বন্ধ।

—আমি এ কথা বলতে পারব না যে সংঘর্ষ সমিতি যা করছে তা অন্যায়। তবে আপনি মানকি-মুণ্ডাদের কাছে যান, এক সম্মেলন করুন, তার চেষ্টা করছি। আমি বলব, ভাই সব! যা হয়েছে, তা হয়েছে। মেনে নিচ্ছি যে সরকার খুব গলত কাম করেছে। এখন বলো কি করা যায়। ডি সি-কে সব বলো; তার কথাও শোন।

—অরুণ সুমরাই এলে লাভ হবে কিছু?

—কিচ্ছু না। আদিবাসীরা ওকে বিশ্বাস করে না। কৈসে করো? সরকার শিল্পপতি, সকলের "ইয়েস ম্যান"কে কে বিশ্বাস করবে?

—অথচ ভোট দেয়। এম. পি. বানায়।

—ওটা তো আদিবাসী সেন্টিমেন্টের ব্যাপার।

—খুবই জটিল কহানি। যাক গে, আপনি না হয় সেই ব্যবস্থাই করুন।

গঙ্গাধর জোংকো বলে, করে দিচ্ছি। বানো গ্রামে ডি সি-র

আহ্বানে এক সম্মেলন হয়েছিল। সম্মেলন হবে জেনে সুরজ নিজের উরুতে চাপড় মেরে হাসে হা হা করে। মেয়েকে আদর করতে করতে বলে। এ বুদ্ধি কি ডি সি-র হতে পারে? এ নিশ্চয় সেই কাংরেসী বুড়ো গঙ্গাধর জোংকো দিয়েছে। গঙ্গাধর খুবই গিদ্‌ধড়।

মা বলে—তুই যাবি না কি?

—নিশ্চয়। বুড়ো বলে পাঠিয়েছে, ও আমাকে "মাটা গাগরাই" বলে পরিচয় দিয়েছে আর ওই পরিচয় যে আমি বহাল রাখি। কি জানি কি মতলব!

—তোর তাতারটা খেয়ে পরে 'ও মানুষ। হয়তো সেই কথা মনে রেখে এখন এ উপকারটা করল।

—তা হবে। ও তো বুরাই রাজনীতি করে, কিন্তু এখনও অরুণ সুমরাইয়ের মত পুরা বরবাদ হয়ে যায় নি।

—তোমার বংশে আয়ু তো কম বেটা—

—বুঝি না অত রাজনীতির কথা। আমি শুধু জানতে চাই তোর ওপর কোনো চোট তো আসবে না?

—কখনো আসবে না। নান্দি ওর বুকে হাত রেখে বলল, কোনো চোট আসবে না? কোনো ক্ষতি হবে না তোমার?

—না রে গঙ্গার মা।

—জানি না? ছেলেদের। তোমার বাবা……

—আমার তাতা কতদিন বাঁচল তা দেখলি না? বুড়ো আমার বিয়ে দেখে তবে মরল।

—তোমার ছেলে দেখে গেল না।

—তা যদি বলিস নান্দি। তোর যেদিকে মনই নেই। তুই একটু মন দিলে বেটার মুখ তো তুইও দেখতে পারিস, আমিও দেখি।

—যাও! গঙ্গার বাপ! তুমি খুবই খারাপ হয়েছ, খুব মন্দ হয়েছ।

সুরজ হাসতে থাকে। নান্দিকে বেকায়দায় ফেলে অপ্রস্তুত করতে তার খুব ভাল লাগে।

বানো গ্রামে স্থানীয় মুণ্ডা-মানকি-মুখিয়া এবং প্রভাবশালী আদি-বাসীদের ডাকা হয়। সামিয়ানা টাঙানো হয়, মাইক আসে। ডি সি আসে পুলিশ পাহারায়। তা দেখেই মুণ্ডা ও মানকিরা অসন্তুষ্ট হয়। কেন? আমাদের কি বিশ্বাস পায় না ডি সি? "বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা" হবে বলে জমায়েত ডেকে পুলিশ এনেছ কেন?

গঙ্গাধরও বোঝে যে কাজটি ভাল হয় নি। সে বলে, এই যে কাজ করলেন, ওরা তো চটে গেল।

—যা হয়েছে তা হয়েছে। আপনি পরিচয় করান।

গঙ্গাধর সকলকে ডেকে পরিচয় করাতে থাকে। সকলের মধ্যে মাটা গাগরাইও থাকে। ডি সি তার হাত ঝাঁকায়। পরিচয় পর্ব চুকলে ডি সি কথা বলতে থাকে। সে বারবার সকলের দিকে তাকায়। কথাগুলি ওরা কীভাবে নিচ্ছে তা জানা দরকার।

—এই চোরা বাঁধ প্রকল্প…এর নাম আপনারা শুনে থাকবেন …একশো একত্রিশ কোটি টাকা খরচ হবে এতে…আর আট-দশ বছর তো বেকসুর কাজ চলবে। তাতে হাজার হাজার লোক কাজ পাবে। তাই তো আমরা বলছি…

—হর ক্ষেত কো পানি, হর হাঁথ কো কাম।

চোখ বুজে কালু সুমরাই বলে এবং রাজকীয় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলে। বলে যান।

—ঠিক বলেছেন। সব ক্ষেতই জল পাবে।

—কৈসে?—এক বৃদ্ধ মুখিয়া বলে।

—কেন পাবে না?

—কেন পাবে না? ডি সি সাহেব। আপনি জেলার মাথা। আমরা মূর্খ, বুনো, জংলী গাঁওয়ার। কিন্তু হাজার হাজার একর আদিবাসী জমিন যে জলের তলায় যাবে, তাহলে সব ক্ষেত জল পাবে কি করে?

—তা যদি বলেন…দেখুন! আদিবাসী জমিন্ নেয়া হবে তো ভাল কাজের জন্যেই। আর জমির বদলে সরকার তো ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।

আরেক বৃদ্ধ মুণ্ডা হাত ওঠায়। সে এসেছে কটিবস্ত্র পরে। মাথায় পাগড়ি বেঁধে, হাতে লাঠি নিয়ে। জামা ও ধুতি তার আছে। কিন্তু সে তো তার জাতীয় পোশাক নয়। খালি গা, কোমরে কটি বস্ত্র, খালি পা, মাথায় পাগড়ি, এই তার জাতির পোশাক।

সে বলে—গ্রাম মুণ্ডা হিসেবে শুধাই, যত জমি যাবে, সরকারের দেয়া টাকায় তত জমি আমরা কিনতে পারব? আমার মনে হয়, পারব না। আর বাঁধ তৈরি হলে সিচাই বন্দোবস্ত ভাল হবে, সব জমিই হবে বেরা জমি। তেমনি জমির দামও হবে চড়া। সে জমি আদিবাসী কিনতে পারবে না।

সকল আদিবাসীরাই তার কথায় সম্মতি জানায়। তারপর মাটা গাগরাই নামক বিশাল বলিষ্ঠকায় লোকটি বলে—ডি সি সাহেব। হয় হাঁথকো কাম। সত্যি মিলবে?

—নিশ্চয়।

—কয়েক লক্ষ লোকের?

—হ্যাঁ···প্রায়···

—কেমন করে?

—বাঁধ গড়তে···ক্ষেতি হবে যখন···

—ডি সি সাহেব। দোষ নেবেন না আমার। আদিবাসী তো রেজাকুলি কাজই করবে, ভালো কাজ তো করবে না।

—এ তো ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ।

—হ্যাঁ, এ বহোত সাচাই কথা যে স্বাধীনতার এত বছর বাদেও কোলহানের ছেলেরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয় না, উচ্চ শিক্ষা পায় না। এ নিশ্চয় আমাদেরই দোষ। ঘরে খাবার থাকে না, ছেলে কৈসে বনে সাইট ইঞ্জিনিয়ার! সেও আমাদের দোষ। কিন্তু এত বড় কাজে আপিসের কাজে বহোত কেরানি, চাপরাশি, পিওন, চৌকিদার লাগবে আর সে সব চাকরীতে লোকও আপনারা নিয়ে নিয়েছেন। কতজন কোল্‌হা বা সিংভূমের লোককে নিয়েছেন জানতে পারি?

—সে তো আমি জানি না···

—আমি বলছি, এক শতাংশও নেন নি। তা কাজ শুরু হল না, এখনি আমরা আউট। কাজ চলবে, বাঁধ হবে, তা থেকে আমাদের কোনো ফায়দা উঠবে? বিশ্বাস করি না। তাহলে এ কাজের জন্যে আমরা ক্ষেতি-জমি-গ্রাম ছাড়ব কেন? ভাই সব। আমি কি ভুল কথা বলছি?

—না না, সব আমাদের মনের কথা।

—কেন বা এত গোপনতা? যাদের গ্রাম নিবেন, ক্ষেতি নিবেন, তারাই বা জানতে পেল না কেন? কেন সব গোপনে ঠিক হয়ে গেল?

—না না, আমাকে বলতে দিন। দেখুন! মানকি আর মুণ্ডাদের জানানো হয় নি, সেটা ভুল হয়েছিল বলেই এই সম্মেলন ডেকেছি।

—গ্রামের তালিকা বানিয়ে, কোথা থেকে কোথায় কি করবেন সব ঠিক করে এখন সম্মেলন ডেকে কি হবে? কোন্ মানকি কোন্ মুণ্ডা তার অপমান ভুলে যাবে?

—পাটনাতে যাঁরা এই প্রকল্প করেছেন, তাঁরা অনেক ভাবছেন কোলহান নিয়ে। সাড়ে সাত লক্ষ টন খাদ্যশস্য দরকার। এখন হচ্ছে সাড়ে তিন লক্ষ টন। সতেরো লক্ষ একর কৃষিযোগ্য জমি আছে। সিচাই পায় শুধু বাইশ হাজার একর। চেরো বাঁধ প্রকল্প হলে দুই লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শো একরে জল মিলবে আর তাতে কত ফসল ফলবে তাই ভাবুন।

—কত জল মিলবে?

—এ বাঁধ থেকে সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ গ্যালন জল মিলবে রোজ। ফলে এ অঞ্চলে কারখানাও হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব হবে। উত্তর বিহারের লোকদের জন্যে আবাদী জমি, কলকারখানা, আর আদিবাসী লোক সেখানে রেজা কুলি হবে!

—আপনারা বুঝছেন না···

এ সময়ে মানকি ও মুণ্ডারা উঠে দাঁড়ায়। কথাটি না বলে তারা

চলে যেতে থাকে। সকলেই চলে যেতে থাকে, চলে যায়। ডি সি হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে থাকে। তার টেবিলে চেরো বাঁধ প্রকল্প লিটারেচার, মাপ, চার্ট, সব ছড়ানো থাকে।

গঙ্গাধর বলে, কাজ হল না।

—মাটা গাগরাই লোকটা কে ?

—ও চাষীটাষী হবে।

এ ঘটনা এখানেই শেষ হয় না। কোলহান সন্তানদের মনোভাবটা কি, তা বোঝা যায় না প্রথমে। কিন্তু বিশ-ত্রিশ মাইল তফাতে তফাতে এই বাঁধ প্রকল্পের জন্যে তৈরি প্রত্যেকটি দালান, গাঁথনি ঘর যখন মাটিতে লুটাতে থাকে, তখন কাজ বন্ধ হয়ে যায় আবার। বিরজিলুহাতুতে আবার গুদাম ঘর হচ্ছিল। পরবে যাবার সময়ে চাঁদো পুর্তি গুদাম ঘরটি ভাঙে, চৌকিদারকে পেটায় ও চলে যায়।

ডি সি জীবনে এমন ফাঁফরে পড়েনি।

পাটনার কড়া হুকুম, কাজ চালু কর।

সাইট ইঞ্জিনিয়াররা অনড়। তাদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা না করলে তারা কাজে যাবে না।

॥ সাত ॥

১৯৮২ সালের জানুয়ারীতে তীব্র শীতে ডি সি সদর শহরে তার আপিসে এক সম্মেলন ডাকে। এ সম্মেলনে মানকি ও মুণ্ডারা আসে। কাংরেস এম পি অরুণ সুমরাই, তার মায়লে স্ত্রী গীতা, আরো কয়েকজন মায়লে থাকে। খুব সংক্ষিপ্ত এ সম্মেলনে অরুণ সুমরাই বলে, চেরো বাঁধ প্রকল্প হবে, হতেই হবে, হতেই হবে। এ কি ক্ষ্যাপামি হচ্ছে সংঘর্ষ সমিতির? কেন তারা বাধা দিচ্ছে?

মানকি ও মুণ্ডারা চুপ করে থাকে।

—এই প্রথম সিংভূমে সমৃদ্ধি আসছে।

মানকি ও মুণ্ডারা অরুণের দিকে তাকায়। হায় অরুণ সুমরাই! কাংরেসের এম পি হয়ে থাকতে থাকতে এ কি পরিণাম হয়েছে তোমার? চেহারায় আদিবাসী আছ। ভিতরে সবটাই পালটে গেছে? সিংভূমে সমৃদ্ধি এর আগে আসে নি? জামসেদপুর, রোরোর অ্যাসবেস্টস কারখানা, ঝিকপানি সিমেন্ট কারখানা এ সবে আসে নি সমৃদ্ধি? কোটি কোটি টাকার মুনাফা সিংভূমের মাটি থেকে উঠে অরুণ সুমরাই! তাতে সিংভূম সমৃদ্ধ হয় না। এই বাঁধ প্রকল্প সমৃদ্ধি আনবে, তাতে সিংভূম সমৃদ্ধ হবে না।

কিন্তু কি লাভ তোমাকে সে কথা বলে? আমরা প্রাচীন এক ব্যবস্থার সন্তান। উইলকিনসনি ব্যবস্থা···ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন···আরো আগেকার কথা আমাদের রক্তে থাকে—কোলহানের স্বাধীন অবস্থার কথা—কাকে বলব?

—আপনারা কাজ করতে দেবেন?

মানকি ও মুণ্ডারা চুপ করে থাকে।

সম্মেলন শেষ হয়। বেরিয়ে এসে সরকারী জীপে ঘরে ফিরতে

ফিরতে মানকি ও মুণ্ডারা বলে, আমাদের চুপ করে থাকাকে ওরা সম্মতি বলে হয়তো ধরে নিল, তা ঠিক। আমরা তো সিদ্ধান্ত নেবার কেউ নই। সুরজ আছে।

—চাঁদোও আছে।

—চাঁদো তরুণ। সুরজ তার চেয়ে বয়সে বড়, আর সে হল আমাদের শক্তি।

—সেও তো যুবকই প্রায়, আমাদের কাছে।

—নেতা হতে হলে বয়সে কি আসে যায়? বীরসা ভগবানের বয়স কত ছিল? সাঁওতালভূমের নায়ক সিধু-কানুর বয়স কত ছিল? সিংরাই আর সুরগার বয়স কত ছিল?

এর একমাস যেতে না যেতে জেলা-প্রশাসন ও পুলিশ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

সেচবিভাগের তিনজন ইঞ্জিনীয়ার চাঁদো পূর্তির গ্রামের কাছে সেচখালের জন্যে জায়গা জরিপ করতে যায়। তাদের গায়ে ছিল গরম পোশাক। তিনজনেই তরুণ, ঝকঝকে পালিশ তাদের চেহারা।

ডি সি তাদের অভয়বাণী দেয়। হাঁ হাঁ, মানকি-মুণ্ডাদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। কোনো হাঙ্গামা হবে না। এখন কাজ চলবে ঝটপট।

জীপ ছেড়ে দিয়ে তারা নেমে যায়। জায়গাটি সেরাইকেলা সীমান্তে। জীপটি থাকে পুলিশ ফাঁড়ির কাছে।

এর ঘণ্টা ছয়েক বাদে, তিনটি উলঙ্গ মানুষ যন্ত্রণায় চেঁচাতে চেঁচাতে জীপের দিকে ছুটে আসে ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাদের জীপে উঠাবার সময়ে পুলিশ ও ড্রাইভার এ-ওর দিকে চায়। এরা তো সেই তিন ইঞ্জিনীয়ার। ভীত ড্রাইভার সবেগে গাড়ি চালায়।

গাড়ি চালাতে চালাতে সে শুনতে পায় ডুম ডুম নাগারা ধ্বনি। গ্রাম হতে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে নাগারার বাজনা।

ড্রাইভারটি তিনজনকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে যায়। ডাক্তার চমকে ওঠে এদের শরীরের দাগগুলি দেখে। চিত করে শোয়াচ্ছে

গেলে তিন ইঞ্জিনীয়ার গোঙ্গাতে থাকে। উপুড় করলে দেখা যায় এদের পিঠে ছোপ ছোপ পোড়া চামড়া ও মলদ্বার ফুলে উঠেছে।

হাসপাতালের লোকরাও সভয়ে মাথা নাড়ে। এই পোড়া পোড়া ছোপ, এই ফুলে ওঠা মলদ্বার, এ সবই তো চেনা জিনিস।

পুলিশ, জেলার হর্তাকর্তা সবাই এসে পড়ে বলে এ তিনজনের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্ব পেয়ে যায়। জবানবন্দী নিয়ে নেয়া হয়। ডাক্তার চিকিৎসা করতে থাকে। ইঞ্জিনীয়াররা চেঁচিয়ে ওঠে।

—অ্যাসিড দিয়েছে, অ্যাসিড!

ডাক্তার ভুলে যায় যে এরা "বহোত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি"।

সে ধমক দিয়ে বলে, নড়বেন না।

—অ্যাসিড দিয়েছে।

—না, অ্যাসিড দেয়নি।

—তবে?

—ভেল্লুয়ার তেল।

—ভেল্লুয়ার তেল!

—হ্যাঁ। আপনাদের ভাগ্য ভালো যে সে তেল টাটকা ছিল না। টাটকা থাকলে আর দেখতে হত না। যাক, কথা বলবেন না, ইঞ্জেকশন দিচ্ছি।

ইঞ্জেকশনের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ওরা শোনে পুলিশী সংলাপ।

—কেন বা ইঞ্জিনীয়ার ধরে ধরে এই দাওয়াই দিল তা বলতে পার?

—কোনো আদিবাসী মেয়েকে দেখে ইশারা করে থাকবে। আর কি কারণ থাকতে পারে?

—না না। ওখানে অলগখণ্ডী আর সংঘর্ষী হাওয়া খুবই গরম। আদিবাসী মেয়ে নিয়ে ইশারা করে থাকলে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে হত না। এর মধ্যে অন্য কোন কথা আছে।

কয়েকদিন বাদে খানেক সুস্থ হলে এই ইঞ্জিনীয়াররা তাদের অভিজ্ঞতার বিবৃতি দেয়।

ওরা সেচখালের জন্যে জায়গা জরিপ করছিল। তখন এক যুবকের নেতৃত্বে তিনজন আদিবাসী ছুটে আসে। "সরকারী পিটুঠু। আদিবাসী জমি ছেড়ে নামে!" বলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কোথায় যে ওদের ধরে নিয়ে যায়, তা ওরা বলতে পারবে না, তবে গ্রামটি চেরো নদীর ধারে এবং একটি নালার ওপর গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি ফেলে চওড়া কাঠের সাঁকো ছিল।

সেখানে ওদেরকে উলঙ্গ করে ফেলা হয়। আদিবাসী মেয়েরা ঝাঁটা ও লাঠি দিয়ে ওদের পিটাতে থাকে এবং সরকারী পিটুঠু বলে গাল দেয়। তারপর ওরা একটা পাত্র আনে। সুঁচলো লাঠির আগায় নেকড়া বেঁধে তাব মধ্যেকার তরল পদার্থে ডুবিয়ে প্রথমে পিঠে মাখায়। কে যেন বলে, চাঁদো। দে ঠিকমত দাওয়াই।

তখন ওদের উপুড় করে ফেলে সেই নেকড়া পিছন দিকে ঢুকিয়ে দেয়।

তারপর ওদের বহে এনে ফেলে দেয় মাটিতে ও বলে, দৌড়া দৌড়া। যা তোর মালিকদের কাছে। ওই দিকে তোদের জীপ গাড়ি।

ডি সি খেঁকিয়ে পুলিশ সুপারকে বলে, সংঘর্ষ সমিতিকে ফাঁসানো যাচ্ছে না। সুরজ গাগরাইকে ফাঁসানো যাচ্ছে না।

—কিন্তু জায়গাটা কোথায়?

সদর মহকুমা দারোগার আওতায় পড়ে। এই দারোগা এ ইলাকা খুব ভাল চেনে ও জানে। সে শুকনো গলায় বলে, এ তো দালাংগিবুর বলে মনে হচ্ছে।

—কোথায় এই হতভাগা গ্রাম?

—সুরজ গাগরাইয়ের গ্রাম চেরোর কাছে।

—ওই চাঁদো কে?

—সংঘর্ষ সমিতির প্রেসিডেন্ট।

—তাই নাকি? এখন তবে বোঝা যাচ্ছে সব। সুরজ গাগরাই সব ঘটিয়েছে নিশ্চয়।

—তাই হবে স্যার। ও জানে, ওই করিয়েছে। নইলে এমন কাণ্ড ঘটতেই পারে না।

এভাবেই "চাঁদো পুতি ও সুরজ গাগরাই" নাম দুটি ঘিরে ফাঁস পরানো হয় ও ডি সি বোঝে, সে সুবিধেমত ফাঁসের দড়ি টানবে, ফাঁসের ফাঁদ ছোট করবে। চাঁদো তাকে সুবিধে করে দিয়েছে।

রাজনগর থানাতে সুরজ গাগরাইয়ের নামে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের আটটি ধারায় ডায়েরি হয়। বাদামি কাগজের ওপর ডট কলম দোড়ায়, লেখা হতে থাকে অভিযোগ।

সম্মিলিত উদ্দেশ্যে দাঙ্গাকারী দল জুটানো, ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর জখম ঘটানো, কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারীকে কর্তব্যকর্মকালে বিরত করার উদ্দেশ্যে গুরুতর জখম ঘটানো, বেআইনীভাবে অবরুদ্ধ রাখা, চুরি, অপরের ক্ষতি সংঘটন—

রাজনগর থানার প্রবীণতম কনেষ্টবল স্বগতোক্তি করে, "রাম! রাম!!"

সে অতীব কৌতূহলী হয়, কেন না ইঞ্জিনীয়ারদের ঘটনাটি ঘটে শুক্রবারে। ওই শুক্রবারে সুরজ গাগরাই তিহারা হাটে গিয়েছিল। তার সঙ্গে সুরজের দেখাও হয়েছিল আর বেশ কিছুক্ষণ ওরা কথা বলেছিল। কথাগুলি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। কেন না দুজনে একই মোরগ কিনতে চাইছিল।

তিহার তো সালাংগিবুর থেকে অনেক দূরে। সুরজ সেখানেই ছিল। তবে কেন সুরজকে ফাঁসানো হচ্ছে? যাকগে! অভিযোক্তা যখন সরকার, তখন দরকার কি তার মাথা ঘামিয়ে?

সদর থানায় সুরজ গাগরাইয়ের নামে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে তিনটি ধারায় ডায়েরি লেখানো হয়। তাতে সে "দেশদ্রোহী" বলে অভিযুক্ত হয়।

এভাবেই সব হয়। পাটনা থেকে ডি সির উপর চাপ। ডি সি

থেকে পুলিশের উপর চাপ। পাটনার উপর সম্ভবত টাউট-মস্তান—ঠিকাদার মায়লে—এম পি—ব্যবসায়ী—শিল্পপতি—বেশ্যার দালাল এদের সম্মিলিত এবং অদৃশ্য চাপ থাকে এবং তা জানা যায় না।

যা হোক, চাপের মধ্যে চাপ, তার মধ্যে চাপ, এহেন কর্মকাণ্ডের ফলে সুরজ গাগরাই যখন তেল মেখে চেরোর জলে ঝাঁপাচ্ছে, সে সময়েই তুটি থানাতে সে দাঙ্গাবাজ, হাঙ্গামাকারী, বিনা-প্ররোচনায় কর্তব্যরত সরকারী লোককে জখমকারী, চোর, দেশদ্রোহী, এমন নানা নামে অভিযুক্ত হয়।

"সুরজ গাগরাই" হয়ে যায় এক 'ওয়াণ্টেড' নাম।

এত সব হতে থাকে কিন্তু এখনো সুরজ গাগরাইকে দেখে সনাক্ত করে এমন কোন লোককে পাওয়া যায় না।

ডি সি তিক্ত ও বিষণ্ণ হেসে বলে, এখন তো ধরা পড়বে সে। গঙ্গাধরজী, আপনি যান না পুলিশের সঙ্গে ধরতে সাহায্য করুন।

—আমি যাব না।

—না যান, ওকে আমরা ধরবই।

ডি সি সাহেব অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চা বিষয়ে শুধাই। সুরজ তো অলগখণ্ডর লোক ?

—তাতে কি ?

—নেতাদের ধরেন না কেন ?

—গঙ্গাধরজী অলগখণ্ড এক খতরনাক আন্দোলন। ও নামে বিষ আছে। কিন্তু নেতাদের ধরলে কত হাল্কা হবে, কত হাঙ্গামা হবে। একবার নেতা হয়ে গেলে তাকে ধরাটা অবুদ্ধির কাজ। এই জংলী পাহাড়ী দেশে এখানে কি হবে, ওখানে কি হবে—বি এম পি ডাকতে হলে তো আরোই ঝামেলা।

—সুরজ গাগরাই কোলহানের নেতা নয় ?

—গঙ্গাধরজী। এখনো সে অত জানপছিনা লোক নয়, ওর তেমন নেতাও হয় নি। কিন্তু অঞ্চল নেতারা আরো বিপজ্জনক। আজ অঞ্চল নেতা, কাল মায়লে বনে, তখন কোন্ বুদ্ধু অলগখণ্ডী

মায়লেকে ধরতে যাবে? তাই বিপদটা গোড়াতেই উখড়ানো দরকার।

—ও। সেই জানে!

—নিশ্চয় আরো জানবেন অল্প জানাচিনা আদমি যখন একদম গোড়ায় বসে কাজ করে, তাতেই বিপদ হয় বেশি।

—বুঝলাম।

গঙ্গাধর অত্যন্ত বিপন্নবোধ করে বেরিয়ে এসে। সুরজ এদের কাছে বিপজ্জনক সে যা, সেজন্য নয়, সে যা হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য বিপজ্জনক। চেরো বাঁধ প্রকল্প। কি হবে সুরজের, কি হবে? সুরজ, সুরজ! তুমি কেন ফৌজে থেকে গেলে না? গঙ্গাধর বোঝে, তার ক্ষমতা কত কম। সুরজের জন্যে সে যদি ভাবতে যায়, তাহলে অরুণ সুমরাই তাকে দল থেকে বের করে দেবে।

তবু হাত-পা তুলে বসে থাকা যায় কি? অনেক মাথা খাটিয়ে গঙ্গাধর তার বহোত দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই কালু সুমরাইয়ের ঘর বানোতে যাওয়া মনস্থ করে।

তার হাঁপাহাঁপি বৃথা হয়। কালু সুমরাই ঘরে ছিল না। রুখিয়ার মা আঙ্গিনায় ঘাস তুলছিল এবং কাক-চড়াই অবাধ্য ঘাস নিজের কপাল ও রুখিয়ার বাপকে ঈর্ষণীয় ভাষায় গাল পাড়ছিল।

গঙ্গাধরকে সে ঘরে বসায়, স্নান করতে ও ভাত খেতে বলে। দেয়ালে সাঁটা সুরজ ও চাঁদোর ছবি শুদ্ধ সংঘর্ষ সমিতির একটি হ্যাণ্ডবিল দেখে গঙ্গাধর চমকে ওঠে।

—এ হ্যাণ্ডবিল কবেকার?

—এই তো, দিন সাতেকের।

—এটা ছড়ানো হয়েছে?

—নিশ্চয়। ঘরে তুলে রাখবো নাকি?

—কালু কোথায়?

—ছুটেছে বিরজিলুহাতু।

—আর ফিরবে ?

—না, পরশু।

গঙ্গাধরের মনে আসে হতাশা। যেন সে চোরাবালিতে তলিয়ে যায়। শুকনো ঠোঁট চেটে বলে কিমিন্ (ছোট ভাই বৌ)! খুব জরুরী কথা বলে যাচ্ছি। খুব সাবধানে বলছি, ঔর কালু বা সংঘর্ষ সমিতির লোক ছাড়া কাউকে বোল না। কথাটা খুব জরুরী।

—বলো।

কালুর বউ সঙ্গে সঙ্গে কঠিন ও গম্ভীর হয়ে ওঠে। তার চোখে ফুটে ওঠে আশংকা।

—এক নম্বর, সুরজের ওপর খুব ভারী কোনো চোট আসছে। সে যেন সাবধানে থাকে ?

—আর কি ?

—সংঘর্ষ সমিতির উপরেও চোট আসছে। এই কথা।

—ব্যস ? ঔর নহী ?

—কিমিন ! সদরে পুলিশ তো সুরজের চেহারাই জানে না। এ হ্যাণ্ডবিল কত ছড়িয়েছে, কার কার ঘরে আছে তা কে বলবে। তবে যত পারে তত ছবি নষ্ট করে দিক।

—হায় সিংবোঙা ! হায় হারংবোঙা। বিনা সুরজ কোলহাদের তো কোনো ভরসাই নেই। তার মেয়ে যে মোটে পাঁচ বছরের। তার যে দানা আছে দুনিয়াতে।

—কিমিন ! আমি যাচ্ছি।

সদুঃখে গঙ্গাধর মাথা নাড়ে ও বলে, ডি সি-কে পরিচয় করালাম মাটা গাগরাই নামে। তাকে চিনি বলে কখনো স্বীকার গেলাম না। আর কি করব ?

একদলা শুকনো কান্না অনেক কষ্টে চেপে নেয় কালুর বউ।

—আমি চলি।

—বাউহোনিয়ার (ভাসুর)! একটা কথা বলে যাও। আমাদের সিংবোঙাও তো সূর্য দেবতা। তা দেবতার নামে সুরজ নাম হয়েছিল বলে কি আজ এমন বিপদ আসছে ? তুমি তো অনেক কথা জানো ?

—না কিমিন! কোলহাদের হক নিয়ে লড়ছে বলে আজ বিপদ আসছে।

গঙ্গাধর চলে যায়। কালুর বউ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর তাকে যেন সাপ ছোবল মারে। ছিট্‌কে ওঠে ও। তার বয়স হয়েছে, দৌড়াতে পারে না, তবু এখন তো বসে থাকা চলে না। কালুর বউ নাগারাটা টেনে উঠোনে নামায়। তারপর বাজাতে থাকে। নাগারা শুনলে সবাই আসবে। সবাইকে বলতে হবে। তারপর তার দেয়ালের ছবি ছিঁড়তে হবে। আরো কত কাগজ, ইস্তাহার, সব লুকাতে হবে। তারপর চেরো দৌড়াতে হবে। হায় গো! শুধু মেয়েরা আর বুড়োরা দৌড়ে দৌড়ে আসছে। এমন দুপুরে যে ছাই! কোনো ছেলে গ্রামে নেই। মেয়েরাই আসুক।

এমনি করেই চাঁদো পুর্তির গ্রামেও খবর পৌঁছে যায়। চাঁদোর মা ও বোন তাকে রাতের অন্ধকারে ঠেলে বের করে দেয়। নিজেরা দৌড়াদৌড়ি করে খবর দেয় ঝালন পুর্তির ঘরে। ঝালনও সংঘর্ষ সমিতির উৎসাহী কর্মী।

রাত সাড়ে নয় টায় চাঁদোরা সালাংগিবুরু ছেড়ে চলে যায়।

ভোর পাঁচটা নাগাদ সেরাইকেলা ডি এস পি, রাজনগর থানার সহকারী দারোগা, এরা এগারোটি জীপে সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই করে ঘিরে ফেলে সালাংগিবুরু। সিংভূমে পুলিশ ইচ্ছে করলে শ্বাপদের মত নীরবে নিঃশব্দে আসতে পারে। সিংভূম হয় ভারতে নয়, নয় তা ভারতের অন্ধদর্পণ।

পুলিশ আসে নিঃশব্দে এবং সহকারী দারোগা হাসান ওদের নিয়ে চলে চাঁদোর বাড়ীর দিকে। সালাংগিবুরু গ্রাম তার যথেষ্ট চেনা-জানা। পুলিশ ঘেরে গ্রামটি এবং পুলিশ ঘেরে চাঁদোর বাড়ী।

চাঁদোর মা ও বোন ঘুমচ্ছিল চাঁদোর কাকার বাড়ী। এ বাড়ী শূন্য পেয়ে পুলিশ ঘরে ঢোকে এবং বাড়ী ও জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করতে থাকে। এখন চালের জালা থেকে বেরিয়ে পড়ে এক

ঝাণ্ডিল হ্যাণ্ডবিল। কোলহানের সূর্য ও চাঁদের মুখ হেসে ওঠে।

বাইরে ভিড় জমে। প্রথমে চাঁদোর বাড়ী, তারপর চাঁদোর কাকার বাড়ী। সে বাড়ীতে ঘা পড়তে চাঁদোর বোন জোসমিনা চেঁচিয়ে বলে, কাকার ঘর ভাঙছো কেন? কাকা তোমাদের কি করেছে?

ডি এস পি হুকুম দেয়। পুলিশ বেয়নেট দিয়ে খোঁচা মেরে জোসমিনাকে সরায় এবং বন্দুকের কুঁদো দিয়ে উন্মত্ত আক্রোশে পেটাতে থাকে মেয়েদের। এমনি করেই ওরা বাড়ী ভাঙে ঝালন পুর্তির, এমনি করেই মারে মেয়েদের।

অনেক পরে, কোনো এক সাংবাদিক, গিয়েছিল রাজনগর। হাসান বলেছিল, হাঁ হাঁ! চাঁদোর ঘরে ঢুকে তার সম্পত্তি অ্যাটাচ করেছি। হুকুম ছিল, কাজ করেছি। কিন্তু আওরতদের গায়ে হাত তুলেছে পুলিশ? এ সবই বকোয়াস। আওরতদের মারব কেন বলুন? ঘরবাড়ী ভেঙেছি? তোবা তোবা। তা কখনো করতে পারি?

—এ অনেক পরের কথা।.

আর এ ঘটনার তেরো দিন বাদে বিহার রাজ্যসভায় মায়লে গীতা সুমুরাই বলেছিল, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে সেরাই-কেলার ডি এস পি। হয় তাকে সাসপেণ্ড, নয় বদলি, কিছু একটা করা হোক।

সে খবর কাগজে পড়ে শেঠনা আবার একলা হয়ে গিয়েছিল ভীষণ রকম। আবার দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক চেপে ধরেছিল তাকে। এ কেমন খেলা? কার স্বার্থে খেলা? ধর্ষণ হয়নি, বলে দিলে ধর্ষণ হয়েছে।

এ তো সহজেই প্রমাণ হবে যে ধর্ষণ হয়নি। তখন আর মেয়েদের মারপিট করার ব্যাপারও গুরুত্ব পাবে না। হয়েছে মারপিট, বাড়ী ভাঙা হয়েছে। কিন্তু তখন প্রশাসন বলে দেবে, ধর্ষণ হয়নি, শুনলাম হয়েছে। এ মারপিটও মিছা কথা।

কেন. কার স্বার্থে গীতা সুমরাই একথা বলল?

সেই হ্যাণ্ডবিল যখন পৌঁছায়, তখন ডি সি গালে চড় খায়। এই সুরজ গাগরাই? এর মুখ তো তার অত্যন্ত চেনা। সেই সম্মেলন বানো গ্রামে……সেই "মাটা গাগরাই" নামে পরিচয় হল……খুব কথা বলছিল আর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলছিল……গঙ্গাধর বলল, ও কোনো চাষীবাসী লোক হবে। গঙ্গাধর তাহলে সবই জানত?

গঙ্গাধরের তলব পড়ে।

—কেন একে "মাটা গাগরাই" বলেছিলেন?

—কেন না ও মাটা গাগরাই।

—কৈসে?

—ডি সি সাব! মাটা ওর ঠাকুর্দার নাম ছিল। বাড়ীর প্রথম নাতি হিসেবে ওর নাম তো মাটা হতেই হবে।

—বটে!

—মানা না মানা আপনার ইচ্ছা।

—আপনার ঠাকুর্দা গঙ্গাধর ছিল?

—সে ছিল সুকরা। আমি চতুর্থ ছেলে। বড় দাদার নামও সুকরা।

—বুঝেছি। আপনি এখন যেতে পারেন। এ সুরজ গাগরাইয়ের সাহস কতখানি তা জানেন? এই মার্চ মাসের ষোলো তারিখ চাইবাসাতে অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চার মহাসম্মেলন হয়। তাতে ও এসেছিল, আর বক্তৃতাও দিয়েছে।

—এখন তো আপনারই জয়জয়কার।

—কৈসে?

—বিশে মার্চ আপনি লাটারবুরুতে আদিবাসীদের বহোত বুঝিয়েছেন, আর বাঁধের কাজও সেখানে শুরু হয়েছে। তাতেই বলছি।

—নিশ্চয়। আর বাইশে মার্চ চাঁদো পুর্তির বাড়ীতেও পুলিশ পাঠিয়েছি।

—নিশ্চয়। তাই বলছি, লাটারবুরুতে যদি কাজ শুরু হয়, তাহলে অন্যত্রও হবে।

—যদি বলেন, তাহলে সুরজ গাগরাইকে ধরতে চাইছি কেন? ওর মতো সাহসী আর বেপরোয়া লোককে ধরাই উচিত, তাই ধরছি।

—ও দেশকে ভালবাসে।

—এবং আপনি ওকে ভালবাসেন। গঙ্গাধরজী! আপনি, অরুণ সুমরাই, আপনাদের মত লোকরা দেশের কাছে প্রয়োজনীয়। আপনারা বুদ্ধিমান। কই, আপনারা তো দেশকে "ভালবাসতে" যাচ্ছেন না? আপনারা জানেন যে, এখন আমরা স্বাধীন। স্বাধীনতার আগে দেশকে ভালবাসা দেখাবার একটা পথ ছিল। স্বাধীনতার পর ঘরে বসে ভালবাসতে হয় মাতৃভূমিকে। স্বাধীনতার আগে যা হয়েছে তা হয়েছে। এখন সরকার আছে, মায়লে আছে, এম পি আছে, তোমার দেশকে না ভালবাসলেও চলবে। এই তো কথা।

—এ বহোতহি তাজ্জব যে সুরজ দেশসেবার জন্যে মেডেল পেল। আপনি তাকে "দেশদ্রোহী" বানিয়ে ছেড়ে দিলেন।

—গঙ্গাধরজী। দেশকে ভালবেসে যে গরিব মানুষকে বলে আপনা হক লড়ে যাও, সে দেশদ্রোহী।

এরপরে আর গঙ্গাধরের বলার কিছুই থাকে না। সে চুপ করে থাকে। লাটারবুরুতে কাজ শুরু হবে। সুরজ নিশ্চয় সেখানে যাবে। চাঁদোর বাড়ি ভাঙ্গা, গ্রামের মেয়েদের পিটানো, সুরজ নিশ্চয় সেখানে হানা দেবে?

—তারপর কি হবে? তারপর?

—আপনিও সুরজকে বাঁচাবার জন্যে বানো ছুটছেন, কত কি করছেন, অত সাহস দেখাবেন না। আপনার দলে আদিবাসী বহোত কম। অন্যরা বেশি। আপনার দলেই যত ঠিকাদার-টাউট-মস্তান, ভুলে যাবেন না।

—না, ভুলে যাব না।

বেরিয়ে এসে গঙ্গাধর ভাবতে ভাবতে পথ চলে। মাটা গাগরাই ছিল বলে তার লেখাপড়া হয়েছিল। তার বিয়ের সময়ে মেয়েকে পণ দেবার মোষও মাটার দান। মাটার নাতি সুরজ। কি হবে

সুরজের ? কোলহানের কোন্ পাহাড়, কোন্ নদীতটশিলা, কোন্ অরণ্যের নামকরণ হবে সুরজের নামে ?

নান্দিও বলে, এর পরে কি হবে।

—এর পর ?

—জানি না।

—তোমাকে যদি ধরে ?

—চেরো গ্রাম আর সদর শহরের মাঝামাঝি যত জায়গা আছে, মানুষ বাধা দেবে।

—তোমার ভয় করছে না ?

—ভয় কেন করবে ? ধরলেই বা ভয় কি ? জামিনে বেরিয়ে আসব, কেস হবে।

গঙ্গা বলে, কিছু বলব না। শুধু বলব তুই বেঁচে থাক। প্রাণে বেঁচে থাক।

—বুঝলাম। দাও তো হাতুড়িটা। দরজাটা পেরেক মেরে দিই। ঘরে থাকি না, কাজও পড়ে থাকে।

—ঘরে থাকলেই পারিস খানিকক্ষণ।

—কি যে বলো মা।

—কি বলি তা কি জানি। আগে কাঁদাল তোর বাবা। তোর দিকে চেয়ে বুক বেঁধে রাখলাম। এখন আমাকে আর নান্দিকে তুই কত তাসনে রেখেছিস তা নিজেও বুঝিস না।

—মা! আমি তো কোনো বুরাই কাজ করিনি।

—বুরাই যারা করে, তাদের উপর তো চোট আসে না বাবা। যারা ভালাই করে এ খুনী সরকার তাদেরই চোট দেয়। চেরোতে বাঁধ হবে। অনেক জল। অনেক ফসল। সে তো কোলহানে কোনদিন ছিলও না, না থাকলে বা কি হবে।

—ওই তো কথা মা!

গঙ্গা আর কথা বাড়ায় না। যেদিন চাঁদোর ঘরে পুলিশ হানা দিয়েছে, সেদিন থেকে তার প্রাণে শুধু ধুকধুক করছে, কিছু ভাল লাগছে না।

সুরজ হেঁকে বলল, আমি যদি মরেও যাই, তবুও কোলহানে আমার নাম থেকে যাবে।

গঙ্গা ছেলেকে, তার ডাকা বুকো বীর কোল্‌হা ছেলেকে গুম গুম করে পিঠে কিল মারল।—হতভাগা! কিছু আটকায় না তোর মুখে?

সুরজের মেয়ে ঝাঁপিয়ে চলে এল, ঠাকুমার দুটো হাত চেপে ধরল।

সুরজ হেসে বাঁচে না। মেয়েকে বলল, খুব চেপে ধরে রাখ। তুই পারবি ঠাকুমাকে জব্দ করতে।

আর এপ্রিল মাসের তিন তারিখে, সংঘর্ষ সৈনিক আড়াইশো জড়ো করে, তীর ধনুক, লাঠি নিয়ে সুরজ গাগরাই লাটারবুরুতে হানা দেয়। কারা কাজ চালাচ্ছে? সরকারের পিট্‌ঠুগুলো কোথায়? ঘেরাও করো, ঘেরাও করো সকলকে।

কাজ ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যরা পালাতে থাকে। স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িও ঘেরাও রাখা হয়, যতক্ষণ না সি আর পি এফ, বাহিনী এসে পৌঁছয়। এই বাহিনী এসে পৌঁছলে তবে সরে যায় সুরজরা।

আবার আতংক ছড়াতে থাকে। না সুরজ গাগরাই থাকতে চেরো বাঁধ প্রকল্পের কাজ চলবে না। কেমন করে চলবে? কোন্ ইঞ্জিনিয়ার যাবে কাজ করতে?

ডি সি এক ঝটিকা সম্মেলন ডাকে। ডি এস পি মাথুর ক্রুদ্ধ মুখে দুমদাম করে পা ফেলে ঢোকে। বলে, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।

দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়।

॥ আট ॥

চৌঠা এপ্রিল, রবিবার, শেষ রাতে বীরসা সেতু পেরিয়ে কোটাবুরু গ্রামে ঢোকার সময়ে দুটি ট্রাক, দুটি ভ্যান ও পাঁচটি জীপের কনভয় নিঃশব্দে ঢোকে নি। মফস্বল ও সদর থানা, রাজনগর ও মনঝরি থানা, দুটি সি আর পি এফ ব্যাটালিয়ন, বিহার মিলিটারি পুলিশ ও জেলা সশস্ত্র পুলিশ—সব জায়গা থেকে বাছাই করা শতাধিক লোককে নিয়ে যখন মাথুর যাচ্ছে সুরজকে ধরতে, সে জানাতে জানাতে যেতে চায়।

কোটাবুরু গ্রাম জেগে ওঠে, সচকিত হয়। বেরিয়ে গেল কনভয়। শুক্লা দ্বাদশীর শেষ রাত। স্বচ্ছ আঁধারে ওরা সারি সারি উদ্যত বন্দুক দেখেছে। এত বন্দুককে কেমন করে রুখবে তীর ধনুক ও গুলতি? কোটাবুরুতে নাগারায় ঘা পড়তে থাকে।

মাথুর তিক্ত হাসে। নাগারা বাজিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে। পাকা রাস্তার পর কাঁচা রাস্তা। বড়াবানোতে বাজছে নাগারা। বড়াবানো ছাড়িয়ে খানিকটা এসে থেমে যায় কনভয়। এখন নামতে হবে, হাঁটতে হবে দুই কিলোমিটার বাঁদিকে। এখন আর কোন পথ নেই।

এই কনভয়ে একমাত্র বেসামরিক অফিসার দ্বিবেদী, সে একজি-কিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট। সব ব্যাপারটিকে "সরকারী" চেহারা দেবার জন্যে তাকে আনা হয়েছে। সে নিজের জীপে এসেছে। অত্যন্ত অনিচ্ছায় এসেছে সে, মুখে তার কথাটি নেই। গুয়ার ঘটনা বারবারই তার মনে পড়ছে। সুরজ গাগরাই তো একলা একটা লোক। একজনকে গ্রেপ্তার করতে এত পুলিশ, এত সিপাহী, একশোর বেশি বন্দুক কেন?

মাথুর পকেট থাবড়ায়। সুরজকে ধরবার জন্যে সে যে

ওয়ারেণ্ট এনেছে, তার বলে সুরজকে ধরতে পারে। সুরজকে ঘরে না পেলে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

কিছু পুলিশ নয়টি গাড়ির পাহারায় থাকে। ওরা এগোয় মাথুরের নেতৃত্বে, এগোতে এগোতে ওরা হোঁচট খায়।

বড় বড় পাথর ফেলে পথ অবরুদ্ধ মাথুর মাথা নাড়ে। এ তো গাড়ি নয়। পায়ে হাঁটা পুলিশ ও ফৌজ। পাথর এড়িয়ে ওরা এগোয়।

প্রথম বাড়িটিই সুরজের। ভোটার তালিকা নিয়ে যারা ঘোরে, তেমন একটি ছেলে বলেছে। বাড়িটা ঘিরে ফেলে ওরা। গ্রাম এখনো ঘুমে অচেতন। চলতে চলতে মাথুর বোঝে যে, গ্রামবাসীরা কয়েকদিন ধরেই রাস্তা অবরোধে রাখছে। অর্থাৎ কয়েকদিন ধরেই তারা প্রত্যহ যে কোন সময়ে সুরজকে ধরতে পুলিশের হানা আশা করছে।

দরজায় দুমদুম করাঘাত।

—কে? ঘুম জড়ানো পুরুষ কণ্ঠ।

দরজায় ধাক্কা। কোন শব্দ সাড়া হয় না কোন গলায়।

এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ যে দু'দিন ধরে সুরজের মা নাতনিকে নিয়ে পড়শির বাড়ি ঘুমোতে যায়। সুরজের বাড়িতে দুটি ঘর। ভিতরের ঘরটি মেরামত করা হবে বলে গঙ্গাই উদ্যোগ করে সব বের করেছে। ছেলের তো সময় হয় না। ঘরের আস্তর খসে খসে পড়ছিল। নাতনি তো তাকে ছেড়ে ঘুমোয় না। গঙ্গা পড়শির বাড়িতে পড়শির মতই ঘুমে অচেতন থাকে।

সুরজ উঠে দাঁড়ায়। দেয়াল থেকে তরোয়ালটা টেনে নেয়। নান্দি তার হাত ধরে, দরজা খুলো না।

—ডাকু হবে। দেখাচ্ছি।

—ওগো, ডাকু নয়। তুমি বুঝছ না?

কিন্তু দরজায় ধাক্কা পড়তে থাকে, পড়তেই থাকে। দরজা খুলতে ভয় পাবে যদি, তবে কি সে বিশিষ্ট মেডেল পেত? পেত কি সার্টিফিকেট? সে তো বীর কোল্‌হা, সুরজ গাগরাই। তার বাবা

গড়েছিল কোলহান ক্রান্তি দল, ও গড়েছে চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি। একবার সংঘর্ষ সমিতি গড়লে দরজা খুলতেই হয়, পালিয়ে বাঁচা চলে না। নান্দির হাত ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে সুরজ দরজা খুলেছিল হাট করে।

চোখে তীব্র আলো। কত সেলের টর্চ? সুরজের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। নান্দি দেখেছিল সার সার উঁচানো বন্দুক আর সার সার মুখ। কে যেন কি বলে গর্জে উঠেছিল আর সুরজ কাটা গাছের মতো পড়ে যায় ডান উরুতে গুলি লেগে। নান্দি এখন পুলিশ ও ফৌজের কর্ডন ভেঙে দৌড়তে থাকে, চেঁচাতে থাকে, গঙ্গার বাপকে মেরে ফেলল, তোমরা এসো। গঙ্গার বাপকে গুলি করল, তোমরা এসো। —তারপর নান্দি চেঁচায়, কোলহানে সূর্য যাকে বলতে তোমাদের সেই সুরজ গাগরাই বুঝি মরে যায় গো চেরোর মানুষরা।

তারপরেই নান্দি পড়ে যায়, চৈতন্য হারায়।

ছুটে আসে গ্রামের লোকজন ও থমকে দাঁড়ায় সার সার বন্দুক দেখে। সুরজকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা, সুরজের ঘর লুট হচ্ছে। গঙ্গার আর্ত চীৎকার, সুরজ রে।—গ্রামবাসীরা দৌড়য় অন্ধকারে। অবরোধ সৃষ্টি করেছিল যেখানে সেখান থেকে ছুঁড়তে থাকে গুলতি।

বড়াবানোতে পৌঁছতে দেখা যায় কোটাবুরুর পথ অবরুদ্ধ। হাজার হাজার আদিবাসী পাথর-পাহাড়-ঘর-ঝোপ, যা পায় তার আড়াল থেকে তীর ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হয়। তাদের দিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে রেখে ফৌজ পাথর সরায়। তীর আসতে থাকে। কনভয় চলতে শুরু করে। আবার অবরোধ। এবার তীর বনাম গুলি।

ট্রাক থেকে সুরজ হেঁকে বলে, ভাই সব! আমার চোট বেশি নয়। আমি ফিরে আসব। ভাই সব!!

পথের অবরোধ সরায় ফৌজ। আর সবচেয়ে আগে হঠাৎ বেরিয়ে যায় দ্বিবেদীর জীপ। সুরজকে গ্রেপ্তার করা হবে, না পাওয়া গেলে তার অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, এই পর্যন্ত ওয়্যা-রেন্টের ক্ষমতাসীমা।

প্রথমেই তাকে গুলি করা হবে, তারপর তার ঘর লুট করা হবে, এমন দ্বিবেদী ভাবে নি। ভীষণ ঘা খেয়েছে সে। তারপর এই গুলি বনাম তীর। আদিবাসী জনতা ও বিহার মিলিটারি পুলিশ। সব কিছুই গুয়ার মতো। গুয়াতে বি এম পি উনষাট রাউণ্ড গুলি চালিয়েছিল, ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়েছিল। এখন বি এম পি গুলি চালাচ্ছে, দ্বিবেদী পালায়।

ম্যাজিস্ট্রেট নেই, বিভ্রান্ত পুলিশ গুলি থামায়।

একটি বিস্ফোরক মুহূর্ত। পুলিশ ও ফৌজের গুলি নিঃশেষপ্রায়। সুরজ গাগরাই! সুরজ গাগরাই!! আদিবাসী কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চার।

সুরজ তাকায়। ফৌজ ও পুলিশ এখন তার দিকে চেয়ে আছে। ডি এস পি মাথুর।

সুরজ হাত তোলে। বলে, আমি বেঁচে আছি। আমার জখম সামান্য। তোমরা শান্ত হও, শান্ত হও।

তারপর চেঁচিয়ে হো ভাষায় বলে, কিছু গুলি আছে।

তোমরা বহোত হিম্মতে লড়েছ। কোন গুরুতর জখম হওনি, জানেও মরোনি। ওরা আবার গুলি চালালে একটা জানও চলে গেলে আমি সইতে পারব না। আমিও ফিরে আসব। আমাদের লড়াই বহোত বাকি আছে।

কনভয় চলে। দু'পাশে আড়াল দিয়ে চলে আদিবাসীরা। কোটাবুরু পেরিয়ে বীরসা সেতু। বীরসা সেতুর ওপারটা বিদেশ। কনভয় চলে যায়। সুরজ হাত নেড়ে চলে ওদের দিকে। তখন বেলা সাতটা। চাইবাসা আধ ঘণ্টার পথ। ক্ষোভে ও দুঃখে আদিবাসীরা বীরসা সেতুটি ভেঙ্গে ফেলে।

জ্ঞান ফিরে আসতে নান্দি আর কোন কথা বলে নি। ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বোবা হয়ে বসেছিল। সুরজের মা গঙ্গা একইভাবে বসেছিল নান্দির পাশে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সম্পূর্ণ অন্য পথ ঘুরে চারটি পুলিশ জীপ আসে। চেরো গ্রামের লোকরা কোনো কথাই বলে নি। নান্দি ওদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়। বড় বড় অফিসারদের দিকে।

পুলিশ সুপার, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার। ডি এস পি মাথুর।

নান্দি খুব আস্তে বলে, গঙ্গার বাপ নেই। —যেন একটা খবর দেবার ছিল। তাই দেয়।

গ্রামের মুণ্ডা প্রাণ সিং বলে, না না নান্দি! ওরা জানতে এসেছে কি কি লুট হয়েছে।

—বন্দুক, লাইসেন্স, রেডিও, সাইকেল, আমার গহনা, কিন্তু গঙ্গার বাপ নেই।

—এমন কথা বোল না নান্দি। তার জখম সামান্য, সকালে তাকে লক্ষ মানুষ দেখেছে।

অপহৃত জিনিসের তালিকা নিয়ে জেলার মাথা স্বরূপ এসব বাঘ, সিংহ অফিসাররা চলে যায়।

আবার তারা ফিরে আসে।

—রাবণ গাগরাই কে?

—আমি।

—টাটায় চাকরি করো?

—করি।

—সুরজের কে হও?

—কেউ নয়।

—দিকে এসো।

জীপে উঠে বসে ঝুঁকে পড়ে মাথুর ওকে কাছে ডাকে ও নিচু-গলায় বলে, বহোত আফসোস। সুরজ মারা গেছে। চাইবাসা পৌঁছে সদর হাসপাতালে নিতে নিতেই সুরজ···আদিবাসীরা পথে এত দেরি করিয়ে দিলে···সদর হাসপাতাল থেকে সুরজের লাশ ওরা নেবে কি?

চেরো থেকে চাইবাসা ঠিক ততটা দূর, যতটা দূর চেরো থেকে লণ্ডন বা নিউইয়র্ক বা টোকিও। চেরো আর চাইবাসার দূরত্ব দুটি নক্ষত্রের মধ্যবর্তী লক্ষকোটি মাইলের দূরত্ব। চেরো আর চাইবাসাকে

নানচিত্রে কাছাকাছি দেখা যায়। আসলে চেরো পৃথিবীতে চাইবাসা অন্য কোনো গ্রহে।

চৌঠা এপ্রিল সন্ধ্যা থেকেই নাগারা বাজে, বেজে চলে। পাঁচই এপ্রিল সন্ধ্যায় চেরো গ্রামের লোকরা গ্রহান্তর থেকে বহে আনে সুরজকে। কোটাবুরু, বড়াবানো, বানো, বিরজিলুহাতু, টোপাবুরু, লাটারবুরু, সালাংগিবুরু, প্রতি গ্রাম থেকে যোগ দেয় মিছিলে, নীরবে চলে চেরোর লোকদের সঙ্গে।

আজ চেরো গ্রামে মস্ত উৎসবের দিন। চেরোর রাজা ঘরে এসেছে। সুরজের উঠোনে হ্যাজাক জ্বলে। অনেক উঁচু মাচাং বাঁধা হয়েছে। বীর কোল্‌হা তো মৃত্যুতেও পারে না মাটিতে শুতে। এই উঁচু মাচাঙে শুয়েই সুরজ গাগরাই তার সঙ্গী-সাথী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ঝটপট শেষ সম্ভাষণ সেরে নেয়। এই সুরজের অক্ষি-কোটরে চোখ দুটি উপড়ানো, বুকের ডানদিকে এক গভীর ক্ষত। কারো কথা শোন না নান্দি, শবাচ্ছাদন নামিয়ে দেয় ও দু' চোখ ভরে সকলে দেখে নেয়। রক্তে টুকে রাখে, দুই হাতের প্রতিটি গাঁট বিচূর্ণিত, পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ উপড়ানো, চামড়া টেনে ছেঁড়া গা থেকে।

শবাচ্ছাদন টেনে দেয়া হয়। সুরজের শরীর এখন ধুলোয় ধুলো হবার জন্য অধীর। সে শরীর পূতিগন্ধ ছড়ায়। সুরজের অন্ধ অক্ষিকোটর ও থেঁতলানো শরীর বলে, ভাই সব! দেখে নাও! যে কোলহান সন্তান কোলহানের অপমানে অপমান মানবে, গরিবের গরিবকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখাবে, অন্য গ্রহের মানুষরা তার দশা এমনই করবে। সে সুরজ গাগরাই হতে পারে, ফৌজী উর্দি পরে বহোত হিম্মত সে লড়তে পারে, তবু তার পরিণাম এমনই হবে, এমনই হয়।

সেই জন্যেই বারবার লড়তে হয়, জোট বাঁধতে হয়। আর কেন? এখন এই দেহটাকে ছুটি করে দাও।

সারা রাত ধরে দূরদূরান্তের মানুষ আসে। নীরবে দেখে, দাঁড়িয়ে থাকে। নান্দি সারা রাত সুরজের হিমশীতল মাথায় হাত বুলায়। সুরজের মা সারা রাত ছেলের আঙুলগুলিতে হাত বুলায়।

ভোরের আলোতে সুরজকে ওরা বহে নেয় ভিতরের ঘরে। আচ্ছাদিত শরীরের ছবি তোলে কেউ। তারপর জল গরম করো স্নান করাও সুরজকে। নতুন কাপড় পরাও। ধান রাখো ওর হাতে, সে ধান তুলে নাও। এ ধানে ফসল ভালো হবে। সব করো, সেরে নাও তাড়াতাড়ি।

তারপর ?

সমাধি দেবে, না জ্বালাবে, সমাধি দেবে, না জ্বালাবে—কে বলবে, সুরজের তো ছেলে নেই।

—জ্বলা দো। —সুরজের মা বলে।

—জ্বলা দো! —নান্দি বলে।

ধূ ধূ চিতা জ্বলে। হা হা বাতাসে কোলহানের বিলাপ। চেরোর জলে সূর্য জ্বলে, চিতায় আগুন জ্বলে।

আর লাটাবুরুতে চেরো বাঁধ প্রকল্পের কাজ শুরু করতে গিয়ে সাইট ইঞ্জিনীয়ার চমকে ওঠে। উদ্ধত একটা মাথা উঁচানো বিশাল পাথরের গায়ে এ কি লেখা আছে, কে লিখল ? সাদা রঙে, কাঁচা হাতের লেখা এ কি কথা ?

—সুরজ গাগরাই শিলা।

—সুরজ গাগরাই শিলা ?

বানো, বিরজিলুহাতু, টোপাবুরু, দিক দিক থেকে সদরে খবর যায়। জীপ ছুটে আসে। আলকাতরা নাও, মুছে দাও।

মুছে দেয়া হয়, আবার লেখা হয়। হ্যাঁ, চেরো বাঁধ প্রকল্প আবার চালু হচ্ছে কিন্তু, এ কাহিনী লেখার সময় পর্যন্ত, আপনাদের কানে কানে বলি, সদর প্রশাসন অসম্ভব ভাবিত, কেন না যে কোন গাছের গায়ে, যে কোনো পাথরের গায়ে সুরজ গাগরাইয়ের নাম সমানে লেখা হচ্ছে, মোছা হচ্ছে, লেখা হচ্ছে, কোলহানেই এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটতে পারে, বলতে কি, সুরজ গাগরাইয়ের মৃত্যুর পর সে প্রশাসনকে অনেক বেশি জ্বালাচ্ছে এবং বীরসা সেতুর গায়ে অসীম ঔদ্ধত্যে লেখা হয়েছে, সুরজ গাগরাইয়ের ভগ্নাবশেষের মধ্যে বহু কাচের ও ধাতুর কচি পাওয়া গিয়েছিল কেন, ডি এস পি জবাব দাও।